ঠাকুর-ঝি।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ।

সন ১৩০৭ সাল

মূল্য ১৲এক টাকা।

ঠাকুর-ঝি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি যেন নিদ্রার কোমলক্রোড়ে ধীরে ধীরে অচেতন হইয়া পড়িতেছে। কোন জনমানবের সাড়া-শব্দ প্রায় আর শুনিতে পাওয়া যায় না। হীরালাল বসুর অন্তঃপুরের দুইটী স্ত্রীলোক তখনও কিন্তু নিদ্রা নাই। ইহাদের মধ্যে হীরালাল বাবুর বিধবা ভগিনী অমলা তখন 'মহাভারত' পাঠ করিতেছিল, আর তাঁহারই ভার্য্যা শরৎ-কুমারী সেই 'মহাভারত' পাঠ শুনিতেছিল। শরৎকুমারী কিন্তু মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল, কারণ তাহার মন তাহার নিজের বশীভূত ছিল না। সে মন কাহার অনুসন্ধানে কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ অমলার পড়ায় বাধা দিয়া শরৎকুমারী বলিল—"ঠাকুর-ঝি, এখন রাত্রির কটা বেজেছে?"

অমলা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"বারটা বেজে গেছে, এইবার একটা বাজবে।"

শরৎকুমারী বিস্মিত হইয়া বলিল—"রাত্তির একটা হলো! তবে বুঝি আর এলো না—"

অমলা। এখনি আসবেন। ততক্ষণ এস না কেন, আমি এই সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানটা পড়ে শেষ করি! এই দ্যাখ বউ দিদি, আর বেশী পাতা নেই।

এই বলিয়া অমলা তাহাকে পুস্তকের পাতা দেখাইল।

শরৎকুমারী কিন্তু উত্তর করিল—"আর তোমার সাবিত্রী-সত্যবান আমার ভাল লাগে না। দ্যাখ ঠাকুর-ঝি, আমি নিশ্চয় বলছি সে আজ আর আসবে না।"

অমলা। কেন বউদিদি মন-খারাপ করিস? সাবিত্রী-সত্যবান ভাল না লাগে, আমি আর একটা ভাল উপাখ্যান তোকে পড়ে শোনাই আয়।

শরৎ। না বোন, তোর মতন আমার পড়াশোনায় মতি নেই। আর আমার জন্যে কেন তুই এত রাত জেগে মরিস? তুই তোর ঘরে গিয়ে শুগে যা, আমি দরজা দিয়ে শুই।

অমলা। শুলেও ত তুমি ঘুমুতে পারবে না বউদিদি; কেবল শুয়ে শুয়ে ভাববে কেন? তার চেয়ে মহাভারত শোন না।

শরৎ। আমার ভাবতে বয়ে গেছে। তিনি মদ খেয়ে কোথায় পড়ে আছেন, আর আমি বুঝি তাঁর জন্যে ভেবে ভেবে আমার নিজের শরীর মাটি করবো?

অমলা। ওকি কথা বউদিদি! কেহ হয়ত একটু আদর

করেছে, দাদা ঘরসংসার সমস্ত ভুলে গিয়ে সেইখানে বসে গল্প করছেন। কেউ হয়ত কোন বিপদে পড়েছে,দাদা অমনি আমাদের কথা ভুলে গেছেন। না হয়, তাঁর কোন বন্ধু বান্ধবের হয়ত ব্যায়ারাম হয়েছে, দাদা তাঁকে ফেলে ঘরে আসতে পাচ্ছেন না। পরের উপকার করতে গিয়ে, দাদা ঘরসংসার সব ভুলে যান; দাদা আমার ভোলানাথ।

শরৎ। ভোলানাথের গুণের মধ্যে এখন মদ খেতে শিখেছেন দেখতে পাই।

অমলা তৎক্ষণাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"আমার দাদার মতন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, দয়ালু ও পরোপকারী এমন কয়জন লোক আছেন ?"

শরৎ। তোমার দাদার মতন মাতাল, লম্পট আর মিথ্যাবাদীও আর কেউ নেই।

শরৎকুমারীর কথায় অমলার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। অমলা যাহাকে এ পৃথিবীর 'আদর্শ দাদা' মনে করে, তাহার উপর শরৎকুমারীর একি দোষারোপ! শরৎকুমারী আবার অন্য কেহ নহে,সেই দাদারই সহধর্ম্মিণী; সুতরাং অমলা বলিল—"বউদিদি, স্বামীনিন্দা করলে নরক দর্শন করতে হয়।"

শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে বলিল—"মাতালের স্ত্রী আবার কোন্ কালে স্বর্গে যায় বোন্ ?"

শরৎকুমারী হাসিতে হাসিতে এই কয়েকটি কথা বলিল বটে, কিন্তু বলিতে বলিতে তাহার নয়নপ্রান্তে হঠাৎ দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। অধরপ্রান্তে হাসি, আর নয়নপ্রান্তে অশ্রু— শরৎকুমারী কে ?

অসাবধানতাপ্রযুক্ত শরৎকুমারী কিন্তু সে অশ্রু গোপন করিতে পারিল না। সে অশ্রু দেখিয়া অমলা বিস্মিত হইয়া বলিল—"বউদিদি, তুমি কাঁদ্‌ছ?"

শরৎকুমারী এইবার সে চক্ষের জল গোপন করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমার ত কাঁদ্‌বার জন্যে ঘুম হয়নি। তবে যদি একটা বড় দেখে পাকা লঙ্কা এনে দিতে পারিস্, তবে না হয় খানিকটা কাঁদলেও কাঁদতে পারি।"

"আচ্ছা বউদিদি!"—এই কথা কয়েকটি বলিয়াই অমলা শরৎকুমারীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া তৎক্ষণাৎ চুপ করিল। শরৎকুমারী কিন্তু ছাড়িল না, বলিল—"কি বল্‌ছিলি বলনা।"

অমলা বলিল—"থাক্ বউদিদি, সে কথা আর বল্‌বো না।"

শরৎকুমারী বলিল—"বল্ না, তোর ভয় কি? আমার হৃদয় যে পাষাণ, আমি মূর্চ্ছাটুর্চ্ছা যাই না।"

অমলা তখন অবনতমস্তকে সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি কি দাদাকে ভালবাস না?"

শরৎকুমারী হাসিয়া বলিল—"এই কথা! দ্যাখ, তোর দাদাকে বলিস্, আমাদের সেই মেনীবেড়ালটার প্রতি আমার যে ভালবাসা আছে, তার প্রতি আমার সে ভালবাসাও নেই!"

অমলা স্তম্ভিত হইয়া শরৎকুমারীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল! সরলা অমলা চতুরার চাতুরী বুঝিবে কিরূপে? অমলা বলিল—"বউদিদি—"

কিন্তু আর কোন কথাই অমলার মুখে আসিল না, কারণ তখন তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অমলার চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে

আরম্ভ করিল। শরৎকুমারী তখন আরম্ভ করিল—"ওলো তুই কাঁদিস্ কেন? আমি না ভালবাসি—তুইত তোর দাদাকে ভালবাসিস—তাতে কি সেটা পূরণ হবে না?"

অমলা তখন ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিল। মুখে কিন্তু কোন উত্তর করিতে পারিল না। শরৎকুমারী পুনরায় আরম্ভ করিল—"দ্যাখ, এমন সময় ছিলো, যে সময় তাকে আমার মাথার মণি করে রেখেছিলুম, কিন্তু সে মণি এখন আঁস্তাকুড়ে টেনে ফেলে দিয়েছি?"

এ কথার অর্থ কিন্তু অমলা বুঝিতে পারিল না। কারণ অমলার বিশ্বাস, মাথার মণিকে কেহ মাথা ছাড়া অন্য স্থানে রাখিতে পারে না। আবার অমলা ভাবিতে লাগিল—"কেবল কি মাথারই মণি?" কারণ অমলার যেন মনে হইতে লাগিল, সে মণি কেবল মাথার নয়। সে মণি মাথার, হৃদয়ের ও সর্ব্ব স্থানের। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অমলা বিধবা, আর শরৎকুমারী সধবা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অমলা অনেকক্ষণ ঐরূপ ভাবিতে লাগিল। এমন সময় সদরদরজায় কাড়ানাড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। ঐ শব্দ অমলার সে চিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইল। অমলা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"ঐ কে কড়া নাড়ছে—দাদা নিশ্চয় এসেছেন।"

শরৎকুমারী কিন্তু অমলার কথায় যেন বিরক্ত হইয়া বলিল—"তবে ত আমার মাথা কিনেছেন! এখন নীচে গিয়ে কে তাঁকে দরজা খুলে দিয়ে আস্‌বে?"

অমলা বলিল—"আমি ঝিকে ডাকি।"

এই কথা বলিয়া, অমলা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"ঝি—ও ঝি—তুই কি ঘুমিয়েছিস বাছা?"

এইরূপ অনেক ডাকাডাকির পর, চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার ব্যাঘাতজনিত ফোঁসফোঁসানি শব্দ করিতে করিতে ঝি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিল—"ঘুমবো কেন গা? আমাদের গরীবদুঃখী লোকের চোখে কি আর ঘুম আছে? আমরা যে গতর খাটাতে এসেছি—আমাদের গতরের কি সোয়াস্তি আছে? সারা দিন খাটো, তবে ত দুটো কৃলো। কড়ি

মাইনে পাবো! আরে আমার চাকরী রে! দেশে গিয়ে ভিক্ষে মাগ্‌লেও দিন চলে যাবে। মনে করেছিলুম—দিন কতক গতর খাটিয়ে কিছু টাকা জম্‌লে, নাতিটির বিয়ে দেবো, তা কাজ নেই মা, আমার নাতির বিয়ে—সে অমনি প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাক্! আমি দেশে—"

ঝির বক্তৃতা আর শেষ হয় না দেখিয়া, অমলা আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না। দাদা তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং অমলা কি আর স্থির থাকিতে পারে? অমলা ঝির কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"মিছে বক্‌ছিস্ কেন বাছা? তোর বাবু এসেছেন, অনেক ক্ষণ বাহিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তুই একবার সদর দরজাটা খুলে দিয়ে আয়না বাছা। আহা, বুড়ো মানুষ ঘুমুচ্ছিলো!"

তখন এই 'বুড়ো' কথাটা ঝির প্রাণে বড় আঘাত করিল। ঝি বিকৃত মুখভঙ্গিমার সহিত আরম্ভ করিল—"আর তোমাদের দয়ামায়ায় কাজ নেই। আমি বুড়ো মানুষ! বুড়ো হলে আর এ সংসারে গতর খাটিয়ে খেতে হ'ত না। গিন্নী বলেন—আমরা পাঁচটা লোক বইত না! অমন পাঁচটি লোকের মুখে আগুণ! এই দেখ না—বাসন মাজ্‌তে মাজ্‌তে আমার নড়াটা টাটিয়ে গেছে!"

এই সময় পুনরায় সজোরে কড়ানাড়ার শব্দ হইল। অমলা ব্যগ্র হইয়া বলিল—"তুই আর গাল দিস্ নে বাছা। দাদা কত ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন, আমি নীচে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে আস্‌ছি।"

শরৎকুমারী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার

প্রাণের ভিতর কি হইতেছিল, আমরা জানি না; কিন্তু মুখে এতক্ষণ কোন কথাই প্রকাশ করে নাই। এখন অমলাকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্য নীচে যাইতে উদ্যত দেখিয়া, শরৎ-কুমারী হাসিতে হাসিতে বলিল—"না ঠাকুর-ঝি, তুই দরজা খুলে দিতে যাস্‌নে। একে তোর সোমত্ত বয়েস, তাতে সে নিশ্চয় আজ মদ খেয়ে এসেছে; শেষে কি একটা কাণ্ড ঘটাবি?"

তাহার পর শরৎকুমারী ঝিকে বলিল,—"ঝি তুই যা। কিন্তু দরজা খুলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসিস্‌। দেখিস, যেন সাম্‌নে পড়িসনে।"

ঝি তখন পুনরায় কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া আরম্ভ করিল—"হাঁগা, তোমার কেমন ধারা আক্কেল গা? ননদ আপনার লোক বলে তার ইজ্জত বাঁচাচ্চো, আর আমি গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি বলে, কি আমার ইজ্জতের ভয় নেই? আমারও এককালে ভরা-যৈবন ছ্যালো, পায়ে চারগাছা বাঁক্‌মল ছ্যালো, হাতে রূপোর বাউটী ছ্যালো, কাণে সোণার মাকড়ী ছ্যালো, কত্তার চারখানা লাঙ্গোল ছ্যালো। ওমা! গরীব হয়েছি বলে কি জাতধর্ম্ম খোয়াবো? এত অধর্ম্ম সইবে না—সইবে না!"

শরৎকুমারী আর মনোভাব গোপন করিতে পারিল না; ক্রোধভরে বলিল—"তুই বুড়োমাগী, তোর এত ভয় কিসের?"

আবার সেই কথা! ঝিও এবার অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"হ্যাঁ গো, মাতালের কাছে আবার বুড়ো ছুঁড়ী আছে নাকি?"

ঝিয়ের কথার আক্কেল দেখলে! অমলার দাদার চরিত্র সম্বন্ধে তাহারই সম্মুখে একটা নীচবংশীয়া ঝির মুখে এরূপ জঘন্য কথা! কিন্তু অমলা সে কথা শুনিয়া কেবল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সে কি ঝিকেও কোন কথা বলিতে পারে? তাহার ততদূর সাহস কথনই হইতে পারে না। কিন্তু শরৎকুমারী ত আর অমলা নয়; আর নিজের মুখে সে স্বামীনিন্দা যতই করুক না কেন, একটা ঝির মুখে তাহার স্বামীর চরিত্রে এরূপ দোষারোপ শরৎকুমারীর সহ্য হইবে কেন? শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—"দূর হ' হারামজাদি! ফের অমন কথা যদি মুখে আন্‌বি—ত তোকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো। এথনি নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিগে যা।"

তখন ঝির মুখে আর কথা নাই! সে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, তাড়াতাড়ি সদর দরজা খুলিয়া দিতে গেল। এতক্ষণ অমলার অনুনয় বিনয়ে যে কাজ না হইয়াছিল, শরৎকুমারীর গর্জ্জনে সে কাজ তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হইয়া গেল!

শরৎকুমারী তখন অমলাকে বলিল—"ঠাকুর-ঝি, তুই এইবার তোর ঘরে যা।"

অমলা ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। আর শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে ঝি, হীরালাল বাবুকে সঙ্গে লইয়া উপরে আসিয়া দেখিল যে, বাবুর শয়নঘরের দরজা বন্ধ! ঘরের দরজা যে কেন বন্ধ, ঝি তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শেষে শরৎকুমারীই তাহাকে সদর দরজা খুলিয়া বাবুকে উপরে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল, অথচ সেই শরৎ-কুমারী এখন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে! মানিনীর অভিমানের রহস্য সে কিরূপে বুঝিবে?

ঝি তখন দরজা বন্ধ দেখিয়া আরম্ভ করিল—"ওমা! দরজা বন্ধ যে! ভাল জ্বালা বাপু। বউমা, দরজাটা খুলে দাওনা, বাবু দাঁড়িয়ে যে।"

হীরালাল বাবু আজ এক বন্ধুর বাগানে নিমন্ত্রণ গিয়াছিলেন, সুতরাং আজ তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি ঝিকে এইরূপ চীৎকার করিয়া ডাকিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"অত চেঁচিয়ে ডাকিস্ কেন, মাগি?"

ঝি প্রভুর কথাও সহ্য করিতে পারে না, আর তাহার মুখেরও কোন আটক নাই; সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ বাবুর মুখের উপরেই ক্রোধভরে বলিল—"আমায় মাগী! এত রাত্তিরে ঘুম

ভেঙ্গে উঠে, সদর দরজা খুলে দিয়ে বাবুকে উপরে নিয়ে এলুম, আর আমি হলুম কি না মাগী!"

কেবল তাঁহার মাতাঠাকুরাণী পাছে শুনিতে পান—এই ভয়ে ঝির চীৎকারে বিরক্ত হইয়া, হীরালাল, তাহাকে এরূপ কথা বলিয়াছিলেন; নচেৎ তাঁহার হৃদয় এখন প্রফুল্লতায় পরিপূর্ণ। সে প্রফুল্লতার পরিচয় এই—হীরালালবাবু তৎক্ষণাৎ অন্য সুরে ঝিকে বলিলেন—"বাপ্‌রে! তোমায় কি মাগী বলতে পারি? তুমি যে আমার ভাটপাড়ার মা ঠাকুরুণ!"

ভাটপাড়ার মা ঠাকুরুণ! ঝি মনে করিল—নিশ্চয় ইহা একটা ভয়ঙ্কর গালাগালি! এরূপ একটা গালাগালি সেই কলহ-প্রিয় ঝির প্রাণে সহ্য হইবে কেন? ঝি তৎক্ষণাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"আবার আমায় যাচ্ছে তাই গাল! ভগবান্, তুমি এর বিচের করো ঠাকুর!"

এই কথা বলিয়া ঝি, তাহার নিজের আয়ত্তাধীন ক্রন্দন অস্ত্র তখন ছাড়িয়া দিল। হীরালালের শরীরের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছিল। হীরালাল আর দাঁড়াইতে পারেন না, এমন কি তাঁহার পড়িয়া যাইবার ভয়ও ছিল। সেই কারণ পুনরায় বিরক্ত হইয়া ঝিকে বলিলেন—"আ মর্ মাগি, আবার নাকে কান্না ধর্‌লি কেন? আস্তে আস্তে ডাক্-না, নইলে মা শুনতে পাবেন যে।"

এই সময় বাবুর মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। বাবুর মুখে আর কথা নাই; কিন্তু তখনও বাবু মনে মনে বলিতেছেন—"উঃ! আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না। এখনো দরজা খুল্‌লে না? এই দেয়ালটা ঠেস্ দিয়ে আর একটু দাঁড়াই। রে মন! ভুলিসনে। দরজাটা খুলে দিলেই নিশ্বাসটা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে সেঁদু

হবে—হা নইলে গন্ধ পাবে। রে জ্ঞান! পালাসনে। তুই পালা-লেই আমিও কুপোকাৎ—"

মনে মনে কুপোকাৎ বলা—আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে এদিকেও কুপোকাৎ! বাবু একবারেই ধরাশায়ী! বাবুকে ভূতলে পড়িতে দেখিয়া ঝির তখন বড় ভয় হইল; সে চীৎকার করিয়া উঠিল —"ও বউমা ঝট্ করে হুড়কো খুলে দাও—বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে।"

বধূমাতা দরজার অন্তরালেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঝির কথায় ব্যস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দেখেন—তাঁহার অকলঙ্ক পূর্ণশশী একবারে ভূতলে গড়াগড়ি। তখন শরৎকুমারী আপনার কর্ত্তব্য ভুলিল না, অতি যত্নের সহিত অজ্ঞান স্বামীকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া তাঁহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। এই সময় ঝি মাগী মনের সাধে চীৎকার ছাড়িল—"হায়! হায়! নিশ্বেসও পড়ে না যে গো! ওগো, এই সে আমায় অকথা কুকথা কয়ে গাল পাড়ছালো গো! ওগো এরি মধ্যে একি সর্ব্বনাশ হলো গা!"

শরৎকুমারী তখন বাবুকে লইয়াই ব্যস্ত; সুতরাং ঝির এরূপ আত্মীয়তার পুরস্কার আর কিছুই দিতে পারিল না। এদিকে ঝির সেই চীৎকারে অমলা ও তাহার মাতা—"কি হয়েছে —কি হয়েছে"—বলিতে বলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবুকে এরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া অমলা বলিল—"বউদিদি, দাদা অমন হয়ে পড়ে আছেন কেন?"

বউদিদি আপনার কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—"কি আর বলবো—আমার মাথা আর মুণ্ডু!"

বউ দিদি বলিতে অক্ষম হইল বটে, কিন্তু ঝি এ সময় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আরম্ভ করিল—"মা ঠাক্‌রুণ গো, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে কি দেখ্‌ছো গো! ওগো এই বেলা কান্নাগোল তুলে দাও গো!"

শরৎকুমারী ঝির উপর বিরক্ত হইয়া বলিল—"আঃ মর্ নেকী মাগী, তুই অমন করে চেঁচিয়ে মরিস কেন?"

ক্রন্দনের নানা সুরে ঝি অভ্যস্ত ছিল, তখন পূর্ব্ব সুর পরিবর্ত্তন করিয়া নাকি-সুরে আরম্ভ করিল—"ওগো মাগী বল্‌ছে না বল্‌ছেই, একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে গো—আর তুমি আমায় মাগী বলো না গো—"

বাবুর মাতা এতক্ষণ বাস্তবিকই অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলেন। কারণ ঝির চীৎকারে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, তাহার পর শয়নগৃহ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া পুত্রকে এরূপ অবস্থায় হঠাৎ পড়িয়া থাকিতে দেখেন; সুতরাং বাস্তবিকই তাঁহার অবাক্ হইবারইত কথা। অনেকক্ষণের পর কথা কহিলেন—"একি সর্ব্বনাশ হলো! বাবা হীরালাল, কেন অমন করে রয়েছ বাবা?"

এই সময় অমলা দৌড়িয়া গিয়া, একটা জলপাত্র আর একখানা পাখা আনিয়া ভ্রাতার সেবায় নিযুক্ত হইল এবং বাতাস করিতে করিতে ব্যস্ততার সহিত শরৎকুমারীকে বলিল—"বউদিদি, তুমি চোখে মুখে জল দাও, আমি বাতাস করি। কোন ভয় নেই—এখনই জ্ঞান হবে।"

শরৎকুমারী যত্নের সহিত সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে ঝিও কিন্তু পুনরায় আরম্ভ করিয়া দিল—"আহা! মিস্তিরদের

বড় ছেলেটা অমনি করে মদ খেয়ে মরে গেল; এত্ত জল ঢাললে—কিছুই হলো না গো—কিছুই হলো না! হায়! হায়! তাই কি বাড়ীতে কেউ পুরুষ আছে গো, যে মা-বোনকে ধরবে—কি এমন বিপদের সময় দু'টো কথা ক'য়ে সান্ত্বনা করবে? এ কি কম বিপদের কথা গা! একখানা খাট কিনে আনবার লোক পর্য্যন্তও নেই গো! বেহারা পোড়ার মুখোর মুখে আগুণ—তুই মাসে সাত সাতটাকা করে মাইনে খাস, তুই রাত্তিরে বাড়ীতে থাকতে পারিস্‌নে!"

হীরালালের মাতাঠাকুরাণীর নাম সাবিত্রী। ঝিয়ের আত্মীয়তা সাবিত্রীর আর সহ্য হইল না। পুত্রের এরূপ অমঙ্গলের কথা মায়ের প্রাণে সহ্য হইবে কেন? তিনি ঝির উপর বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"অঃ মা—নেকা উল্টো মাগী, তুই অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনিস্ কেন?"

অমলার সে সকল কথার প্রতি লক্ষ্যই ছিল না। অমলা শরৎকুমারীকে বলিল—"বউদিদি, খুব বেশী করে চখেমুখে জলের ছিটে দাও।"

শরৎকুমারী জোরে কয়েকবার চক্ষুতে জলের ছিটা দিবামাত্র হীরালাল চক্ষু উন্মীলন করিলেন। চক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন —"একি! মা, অমলা, শরৎ! আমি যে মদ খেয়ে এসেছি, তা এরা সকলে টের পেয়েছে নাকি?"

অল্পক্ষণ চিন্তার পর বুদ্ধিমান হীরালাল মাতাকে সে বিষয় গোপন করিবার জন্য বলিলেন—"মা, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, আমার মৃগী রোগ হয়েছে।"

পুত্র যেরূপ অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে ও অস্পষ্ট ভাষায় উপরোক্ত কথা কয়েকটি বলিলেন, তাহাতেই মাতাঠাকুরাণীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! তিনি অনিমিষ-নয়নে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিল; সুতরাং মুখরা শরৎকুমারী তখন গর্জ্জিয়া উঠিল—"তোমার মরণরোগ হয়েছে।"

বধূর কথা মাতার প্রাণে বড় আঘাত করিল। তাঁহার সরলমনে তিনি পুত্রের কথাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন; সুতরাং তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"ওকি কথা, বউ-মা!"

পরে পুত্রকেও সস্নেহ-বচনে বলিলেন—"তোমার এমন রোগ কেন হলো বাবা? হে মা কালীঘাটের কালি! আমি তোমার পূজো দেবো—বুক চিরে রক্ত দেবো মা—তুমি আমার বাছাকে ভাল ক'রে দাও।"

পুত্রের মঙ্গল-উদ্দেশ্যে দেবীর নিকট শাশুড়ীর এরূপ প্রার্থনা কিন্তু শরৎকুমারীর ভাল লাগিল না। শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ বলিল—"রোগ আবার কি হবে? দেখছো না মা, তোমার বংশের ধ্বজা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছে! তোমার কি নাক নেই—তুমি মদের গন্ধ পাচ্ছ না?"

হঠাৎ অন্ধকার গৃহে আলো জ্বালিলে, যেমন সে অন্ধকার তৎক্ষণাৎ তথা হইতে ছুটিয়া পালায়, শরৎকুমারীর এই কথায় পুত্রের চরিত্রসম্বন্ধে মাতার অনভিজ্ঞতাও যেন তৎক্ষণাৎ কোথায় পলায়ন করিল। সাবিত্রী হঠাৎ যেন আকাশ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তিনি যাহা স্বপ্নেও কখন মনে করেন নাই, আজ তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। সাবিত্রী বিস্মিতস্বরে বলিলেন—

"য়্যা—এ মদের গন্ধ! ও হীরু, তুই উচ্ছন্ন গেছিস্!—তুই গোল্লায় গেছিস্! তুই যে আমার শিবরাত্রের সলতে রে! আমি ম'লে তুই যে আমার মুখাগ্নি করবি রে—তুই যে আমার পিণ্ডি রেঁধে মুখে তুলে দিবি রে? তুই মদ খেতে শিখেছিস্!"

সাবিত্রী আর বলিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। হীরালাল মাতার নিকট বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন; অনেকক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তাহার পর কি একটা কথা মনে করিয়া, তখনও আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বলিলেন—"না মা, এ মদের গন্ধ নয়; দাঁতের গোড়ায় বড় বেদনা হয়েছিল ব'লে, একটা ওষুধ দিয়েছিলুম; এ সেই ওষুধেরই গন্ধ। সে ওষুধের নাম পর্য্যন্ত বলে দিতে পারি। সে ওষুধের নাম—ক্লোরিক ইথার।"

সুরাপায়ীর কি শোচনীয় অধঃপতন! হীরালাল একজন শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠ যুবা হইয়া, আজ কিনা তাহার পরমারাধ্যা ও পূজনীয়া জননীর সম্মুখেই অবলীলাক্রমে এরূপ জঘন্য মিথ্যাকথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে!

এই সময়ে শরৎকুমারী শাশুড়ীকে বলিল—"মা, তুমি অবাক্ হয়ে কি মাতলামী দেখছো? কথা জড়িয়ে পড়ছে টের পাচ্ছ না? তুমি ঠাকুরঝিকে নিয়ে শোওগে যাও। যা ঝি, তুইও শুগে যা।"

শরৎকুমারীর কথা শেষ হইতে না হইতেই, ঝিও তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। কিন্তু শরৎকুমারীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অমলা

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন শরৎকুমারীর সে কর্কশ কণ্ঠস্বর আর ছিল না; বিশেষতঃ তাহার শেষ কয়েকটা কথা এরূপ করুণস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল যে, সে স্বর শুনিয়া অমলার চক্ষে জল আসিল। দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া, অমলা মাতার পশ্চাতে চলিল। মাতা তখন মনে মনে আপনার মৃত্যুকামনা করিতেছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাতাঠাকুরাণী ও অমলা চলিয়া গেলে পর, শরৎকুমারীর মুখে পুনরায় ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যতক্ষণ হীরালাল অসুস্থ অবস্থায় ভূমিশয্যায় পড়িয়া ছিলেন, ততক্ষণ স্বামীকে সুস্থ করিবার জন্যই শরৎকুমারী সক্রোধে সেবা করিতেছিলেন; কিন্তু যখন স্বামী এতদূর সুস্থ হইলেন যে, মাতাঠাকুরাণীর নিকট নিজের দোষ গোপন করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন, তখন স্বামীর অবস্থার কথা ভাবিয়া শরৎকুমারীর প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। অমলা ও সাবিত্রী চলিয়া যাইবার পর, পুনরায় শরৎকুমারীর ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কারণ শরৎকুমারীর ক্রোধের সময় অসময় জ্ঞান ছিল না, বা ভাবী পরিণামের প্রতিও কোন লক্ষ্যই নাই! শরৎকুমারীর ঐটি বড় দোষ। তাও বলি—কাহার ক্রোধেরই বা সে লক্ষ্য আছে? শরৎকুমারী ক্রোধভরে বলিল—"বলি ও মাতাল, ও মিথ্যাবাদি, মা-বোনের সুমুখে মাতলামী করতে আর মিথ্যাকথা বলতে লজ্জাবোধ হলো না?"

হীরালাল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া উত্তর করিলেন—"সে লজ্জার মাথা তুমিই খেয়েছ।"

তাহার পর শরৎকুমারীর কর্কশকণ্ঠস্বরে তাহার ক্রোধের পরিমাণ যখন বাবুর হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন তিনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"আরো শুন শরৎ, আমার এ মাতলামীরও তুমিই গুরু—আবার এ মিথ্যা কথারও তুমিই গুরু। মনে পড়ে শরৎ—আমি এক বৎসর বিজয়ার দিন, মামার বাড়ী থেকে সিদ্ধি খেয়ে বাড়ী এসেছিলুম; তুমি সে দিন আমায় মাতাল মনে ক'রে আমার সঙ্গে কত ঝগড়া করলে? আর সেইদিন থেকে আমার নাম রাখলে কি না মাতাল! আরও মনে পড়ে কি—আমার বন্ধু সুরেশের যে রাত্রে কলেরা হয়, আমি সে রাত্রি বাড়ী আস্তে পারি-নি; সকালে এসে সমস্ত সত্য কথা তোমায় বলুম, তুমি সে কথা বিশ্বাস না ক'রে, আমায় আমার মুখের সাম্নে মিথ্যাবাদী বলে গাল দিলে! আর সেই থেকে আমার নামই তুমি রেখেছ মিথ্যাবাদী। শুন শরৎ শুন! তুমি মাতাল নাম রেখেছিলে, তাই আমি আজ মাতাল! আর তুমিই আবার মিথ্যাবাদী নাম রেখেছিলে, তাই আজ আমি মিথ্যাবাদী!"

হীরালাল বাবুর উত্তেজিত কথায়, শরৎকুমারীর ক্রোধের মাত্রা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইল। শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে বলিল—"বলি ও সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! আজ এত রাত্তির অবধি কোন্ চুলোয় ছিলে? আজও কোন বন্ধুর ওলাউঠা হয়েছিলো না কি?"

হীরালাল। এর উত্তরেও আমি মিথ্যা কথাই বল্‌বো। এখন তোমার কৃপায় মদে আমার ঘৃণা নেই, মিথ্যে কথাও আর আমার মুখে আটকায় না!

শরৎ। আর তোমায় সে পাপের ভাগী হ'তে হবে না;

আমি সব বুঝেছি—সব জেনেছি। এত রাত্তিরে মদ খেয়ে কোন্ ভালখাকীর ঘরে পড়েছিলে ?

হীরালাল বাবুর এখনও বেশ নেশা ছিল, মদের উত্তেজনার উপর শরৎকুমারীর নীরস ও কর্কশকণ্ঠের উত্তেজনায় প্রথমে উত্তেজিত হইয়া প'ড়িয়াছিলেন; কিন্তু এবার সেই নেশার মহিমায় সরস বিদ্রূপাত্মক ভাষায় আরম্ভ করিলেন—"কি মধুর-ভাষিণি, আবার নেশা ধরাবে না কি ? এত ক'রেও তোমার আশা মিট্‌লো না ? মদ, মিথ্যে কথা—তার উপর আবার বেশ্যা ! কুচ্ পরোয়া নেই—সাবাস্ ! সাবাস্ ! আর এক ডিক্রি উপরে উঠ্‌বো ! প্রথমে হলুম মাতাল, তারপর হলুম মিথ্যাবাদী, এইবার হবো লম্পট ! সাবাস্ ! মধুরভাষিণি—সাবাস্ !"

এতক্ষণ পরে শরৎকুমারীর হঠাৎ যেন একটা চৈতন্য হইল। শরৎকুমারীর সে ক্রোধের লক্ষণ আর নাই ! সেই কর্কশ কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে এইবার মধুর কণ্ঠে বলিল—"আর কথায় কাজ নেই। রাত্তির প্রায় শেষ হয়ে এলো, এখন গিয়ে শোবে চল, তা নইলে কাল নিশ্চয় তোমার অসুখ করবে।"

হীরালাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার ঐ বিদ্যুতের আলোয় আমার আর কাজ নেই। যেমন অন্ধকারে আছি, যেন চিরকাল তেম্‌নি অন্ধকারেই থাকি। তুমিও এতক্ষণ যেমন বজ্রনাদের সহিত বাক্যসুধা-বর্ষণ কর্‌ছিলে, চিরকাল তেমনি সুধাবর্ষণ কর। মধ্যে মধ্যে এ বিদ্যুতের আলোর আর দরকার নাই !"

শরৎকুমারীর কথার সুর তখন পুনরায় একটু চড়িয়া গেল। তবে এ চড়া তত কড়া নয়; ইহাকে বরং মিঠেকড়া বলা যাইতে পারে। শরৎকুমারী বলিল—"বলি এমন বিষ খাবার দরকার

কি? সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করে লাভটা কি হয়? কোন্ দিন যে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে মরবে!"

হীরালালের স্ফূর্ত্তির তখনও হ্রাস হয় নাই। সুতরাং স্ফূর্ত্তিযুক্তস্বরে বলিলেন—"বা! বা! আমার গাড়ী চাপা পড়েও মরা যায় নাকি? সুবুদ্ধিদায়িনি! আমি যে এতদিন একটা মরবার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম চাঁদ। তুমি এত বুদ্ধি কোথায় পেলে? আমি যে তোমায় এতদিন কেবল মধুরভাষিণী বলেই জানতুম। দেখ, শরৎ—আমি মাতাল নই; একবার অজ্ঞান হয়ে ছিলুম বটে, কিন্তু এখন আমার জ্ঞান টনটনে আছে। তোমার যা কিছু বিদ্যেবুদ্ধি থাকে, প্রকাশ করে ফেলে ফ্যালো—এ তোমার তুর্ব্বাবনে মুক্ত ছড়ান হবে না।"

তখন শরৎকুমারীর আর সহ্য হইল না। সেই মিঠেকড়া স্বর দেখিতে দেখিতে পুরো-কড়ায় উঠিল। সেই ক্রোধরূপ ভুতটা পুনরায় তাহার ঘাড়ে ঝাঁকিয়া চড়িয়া বসিল। শরৎকুমারী ক্রোধভরে বলিল—"তবে সমস্ত রাত বসে বসে এইখানে মাৎলামি কর, আমি ঘরের দরজা দিয়ে শুইগে।"

কথাটা কেবল মুখে বলা নয়—যেমন বলা কাজেও তাই। শরৎকুমারী অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, সত্য সত্যই শয়নঘরের মধ্যে গিয়া ঘরের দরজা সজোরে বন্ধ করিয়া দিল। এ জগতে ক্রোধের অসাধ্য কাজ আর কি আছে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমারী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিবার পর, হীরালাল ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইচ্ছা এইবার শয্যায় গিয়া শয়ন করেন। কিন্তু এখন আর সে ইচ্ছা সফল হইবে কিরূপে? শরৎকুমারী এদিকে যে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। হীরালাল দুই একবার সজোরে দরজা ঠেলিলেন, বাক্যের দ্বারা শয়নের ইচ্ছা শরৎকুমারীকেও জানাইলেন; কিন্তু শরৎকুমারীর ঘাড়ের সেই দুষ্ট ভূতটা তাহাকে দরজা খুলিতে আর ছাড়িয়া দিল না, সুতরাং হীরালালের সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হইবে কিরূপে? ইচ্ছা পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু প্রাণে একটা বড় আঘাত লাগিল। হীরালাল বাতায়ন-পথে শয্যায় শায়িতা পত্নীকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"কি! আমি বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি! আর আমার পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী আমারই পালঙ্কের উপরে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে!"

হঠাৎ এককালীন সহস্র বৃশ্চিকদংশনের যন্ত্রণায় হীরালাল অস্থির হইয়া উঠিলেন! এ যন্ত্রণার কিসে উপশম হয়—এখন হীরালাল তাহার জন্য ব্যগ্র হইলেন। হীরালালের পক্ষে এ পৃথিবীতে সে যন্ত্রণার নিবারণের আর কি ঔষধ আছে? একটা আত্মগ্লানি

আসিবার পথ তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং হীরালাল উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"মদ কে বলে তুমি আমার শত্রু? তুমি আমার বন্ধু—পরম বন্ধু—এখন আমায় এই যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করো।"

হীরালাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দ্রুতপদে উপর হইতে নীচে নামিতে লাগিলেন। মনে আর অন্য চিন্তা কিছুই নাই—কেবল একমাত্র চিন্তা--এত রাত্রিতে কোথায় মদ পাওয়া যায়!

হীরালাল বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলে পর, কিন্তু শরৎকুমারী মনে মনে স্থির করিল যে, এইবার দরজা ঠেলিলেই খুলিয়া দিব। কিন্তু হীরালাল তখন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং দরজা আর ঠেলিবে কে? এদিকে শরৎকুমারীরত কথার কথায় ক্রোধ,সুতরাং সে ক্রোধ ও আর কতক্ষণ থাকিবে? ক্রোধ যদি গেল, তবে শরৎকুমারী কি আর তাহার স্বামীকে বাহিরে রাখিয়া, শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারে? শরৎকুমারী শয্যায় পড়িয়া কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করিল বটে; তাহার পর কি একটা কথা মনে হইবামাত্র—ক্রোধ, মান, অভিমান সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া, তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু এ কি! দরজা খুলিয়া সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে শরৎকুমারী যে একবারে অন্ধকার দেখিল!

হায়! শরৎকুমারীর হীরালাল কোথায়? শরৎকুমারী তখন মণিহারা ফণীর ন্যায় চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। শরৎকুমারী না সেই মাথার মণিকে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়াছে? তবে এই গভীর রাত্রে তাহার জন্য এত দৌড়াদৌড়ি

কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরৎকুমারীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহাকে বুঝিতে পারা যায় না।

বুঝিতে পারা না যাউক, কিন্তু এখন তাহার হীরালাল গেল কোথায়? যে আত্মগ্লানি হীরালালের আদৌ আসিল না, শরৎকুমারীর কিন্তু সেই আত্মগ্লানি আসিয়া উপস্থিত। শরৎকুমারী তখন স্বামীর অন্বেষণ করিতেছিল, আর সকাতরে মনে মনে বলিতেছিল—"আমার মুখে আগুন, আমার রাগের মুখে আগুন, এত চেষ্টা করি, তবু কেমন রাগ সাম্‌লাতে পারি-নে! তাঁকে দেখ্‌লেই কেমন কোথা থেকে রাগ এসে পড়ে, আবার না দেখ্‌লে অস্থির হয়ে বেড়াই। কোথায় তুমি জীবিতেশ্বর আর একবার দেখা দাও, আমি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবো—দাঁতে করে কুটো বইবো। তোমায় বড় ভালবাসি, তাই বড় ব্যথা পাই। তুমি একবার আমায় দেখা দাও। প্রাণেশ্বর, প্রভু, একবার দাসীকে শ্রীচরণ দর্শন দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।"

স্বামীর দেখা শরৎকুমারী তখন আর কোথায় পাইবে? শরৎকুমারী ব্যাকুলপ্রাণে নীচে—উপরে—সর্ব্বত্রে খুঁজিল; তাহার পর সদরদরজা খোলা দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিল। তখন একটা নৈরাশ্যের ভীষণ আঘাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শরৎকুমারী এ সময় কি যে করিবে—প্রথমে কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না; কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে ঝিকে ডাকিল। ঝি নাসিকাধ্বনিতে দিক্‌-দিগন্তর কম্পিত করিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল। শরৎকুমারী তাহাকে অনেক ডাকিল, তথাপি তাহার আর নিদ্রাভঙ্গ হইল

না। সে অপূর্ব্ব নাসিকাধ্বনি থামিল, সে সজোরে নিশ্বাসের টানও কমিল; কিন্তু সে জাগ্রত-নিদ্রা আর ভঙ্গ হইল না। তখন অগত্যা শরৎকুমারী, স্থির নিদ্রাভঙ্গের আশা পরিত্যাগ করিয়া, শ্বাশুড়ীকে সংবাদ দিল; সঙ্গে সঙ্গে অমলাও সে সংবাদ পাইল। মাতাভগিনীর প্রাণ সে সংবাদে বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। এই গম্ভীর রাত্রিকালে কোথায় কিরূপে তাঁহারা হীরালালের অনুসন্ধান করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মাতা, ভগিনী ও স্ত্রীতে অনেক পরামর্শ হইল; কিন্তু কোন ফলই হইল না—এরূপ অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকের দ্বারা সেই গভীর রাত্রিকালে কিরূপে হীরালালের অনুসন্ধান হইতে পারে? অমলা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। জননী সরবে চীৎকার করিয়া কাঁদিল, কিন্তু শরৎকুমারীর চক্ষে একবিন্দু অশ্রু কেহ দেখিতে পাইল না!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, ঝড় হউক—জল হউক, ইহার অন্য কোন ব্যতিক্রম কখন হইতে পারে না; সুতরাং গত কল্যের রাত্রি ত প্রভাত হইয়া গেল। যাহার সুখের রাত্রি, তাহার রাত্রি কিরূপে চলিয়া যায়, সে তাহা জানিতে পারে না। কিন্তু যাহার দুঃখের রাত্রি, সে রাত্রি কিরূপে অতিবাহিত হইতেছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারে। হীরালাল বাবুর সুখের রাত্রি কিরূপে প্রভাত হইয়া গেল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গের রাত্রি—দুঃখের রাত্রি, সুতরাং সে রাত্রি কিরূপে গত হইল, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

প্রভাতে হীরালাল বাবুর অনুসন্ধানের জন্য স্থানে স্থানে লোক পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু বেলা দশটা পর্য্যন্ত কোন অনুসন্ধানই পাওয়া গেল না। আমাদের বোধ হয়, হীরালাল বাবুর রাত্রি তখনও প্রভাত হয় নাই। বেলা দুই প্রহরের সময় হীরালাল বাবুর বন্ধু সুরেশ বাবু সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহারই বাড়ীতে হীরালাল বাবু আছেন, এবং অদ্য তাঁহার আহারাদি সেইখানেই হইবে। আরও বলিয়া পাঠাইলেন—সন্ধ্যার সময় তিনি তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিবেন, সুতরাং উদ্বিগ্ন

হইবার কোন কারণ নাই। হীরালালের জননী প্রভৃতি সুরেশ বাবুকে সচ্চরিত্র বলিয়া জানিতেন, সেই কারণ এ সংবাদে অনেকটা সুস্থির হইলেন।

প্রভাতে বাড়ীর সেই ঝি উঠিয়াই বাড়ী সরগরম করিতে আরম্ভ করিল। একেত রাত্রিতে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, তাহার উপর বাবু সেই রাত্রে বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ায় তাহার দুর্ভাবনারও একটা কারণ ছিল; সুতরাং ঝির মনের অবস্থা ভাল ছিল না। ঝির প্রথম শিকার হইল—বাড়ীর সেই বেহারা। সে আসিয়া উপস্থিত হইবমাত্র, ঝি তাহাকে অতি মধুরভাষায় অভ্যর্থনা করিল। সে অভ্যর্থনাটা এইরূপ হইল—"পোড়ারমুখো, মনিবের মাইনে খাবনে? সন্ধ্যে না হতে হতেই কোন্ চুলোয় চলে যাস্? কাল আমি না থাক্‌লে যে, বাবু মারা যেতো। তখন তোকে মাসে মাসে কে মুটো মুটো মাইনে দিতো রে পোড়ার মুখো?"

ভোলানাথ বেহারা, ঝির এইরূপ অভ্যর্থনায় অবাক্ হইয়া রহিল। সে মনে করিল—গত রাত্রে নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটিয়াছিল, সুতরাং রাত্রিতে বাড়ীতে না থাকা, তাহার অন্যায় হইয়াছে। সেই কারণ, সে ঝির এরূপ অভ্যর্থনায় একটিও দ্বিরুক্তি করিল না। ভয়ে শরৎকুমারীর নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইল না। সে ধীরে ধীরে অমলার নিকট জিজ্ঞাসা করিল—"রাতমে বাবুকা ক্যা হুয়া মাজী?"

মাজী তখন কি উত্তর করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে অমলা বলিল—"বাবুর অসুখ করেছিলো।"

বাবুর অসুখের কথা শুনিয়া, গোপানাথ তাড়াতাড়ি বাবুর শয়নঘরে প্রবেশ করিল; কিন্তু সেখানে গিয়া বাবুকে দেখিতে পাইল না। সে ঘরে শরৎকুমারী ছিল। শরৎকুমারী গোপানাথকে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাবুর অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিল, সুতরাং গোপীনাথ তখনও বাবুর অসুখটা যে কি তাহা বুঝিতে পারিল না। এদিকে অমলা, ঝির রকম সকম দেখিয়া বড়ই ভীতা হইল; পাছে তাহার দাদার এই কলঙ্কের কথা ঝি কাহার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে, সেই কারণ তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল—"ঝি, আমার মাথা খাস্, কাল্ রাত্রের কথা যেন কারু কাছে বলিস্-নে।"

অমলা আর গোপানাথ—এই বাড়ীতে ঝির এই দুইটী শিকার ছিল; ইহাদেরই উপর ঝি আপনার গায়ের ঝাল মিটাইত। গোপীনাথের পালা শেষ হইয়াছে; এখন অমলাকে পাইয়া ঝি গর্জ্জিয়া উঠিল—"হাঁ গা, সারাদিন খেটে মর্‌বো—সারারাত ঘুমুতে পাবো না—আর মুখের কথা একটা, তাও কাকেও বল্‌তে পার্‌বে না? এতখানি করে মরি, একবার সে কথা মুখেও আন্‌বো না?"

অমলা ঝির চরিত্র জানিত। তাহাকে কোন কথা একভাবে বলিলে, সে কখনই সে ভাবে সে কথা গ্রহণ করিত না; তাহার নিজের একটা ভাব ছিল; সে যখন যে ভাবে থাকিত, অন্যের ভাল মন্দ সকল কথাই সে তখন সেই ভাবেই লইত। তবে ঝির এ রোগের ঔষধও অমলার জানা ছিল। অমলা তাহার দাদার জন্য অস্থির, সুতরাং সেই ঔষধ প্রয়োগ করিল। আপনার বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটি মুদ্রা বাহির করিয়া ঝির হস্তে দিয়া বলিল—

"ঝি, তুই আমাদের ঘরের লোক, একথা প্রকাশ হ'লে দাদার নিন্দে হবে। তুই ঘরের লোক হ'য়ে দাদার যাতে নিন্দে হয় তা কি করে করবি ?"

মুন্নার মোহিনীশক্তিতে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, ঝি আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল—"সে কি দিদিঠাকরুণ ? বাবুর নিন্দে আমি করবো—এমন গয়লায় মেয়ে আমি নই! বাবুর যে নিন্দে করবে, আমি তার নাক কান কেটে দেবো—গাল দিয়ে তার ভূত ভাগিয়ে দেবো—তবে আমি ছাড়বো "

অমলা ধীরে ধীরে বলিল—"তোকে ভাল মন্দ কিছুই করতে হবে না বাছা। তুই একথা না প্রকাশ করলেই হলো।"

ঝি এইবার উত্তর করিল—"এ কথা কারু কাছে পেরকাশি! বুক ফাটবে দিদিঠাকরুণ, তবু মুখ ফুটবে না।"

অমলা তখন নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল : কিন্তু ঝির ত বড় বিপদ! ঝি আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারে না; কারণ অন্য কথা কহিতে গেলে, যদি রাত্রের কথাটা বাহির হইয়া যায়! ঝি আজ নীরবে বাসন-মাজা, ঘর-ধোয়া প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম শেষ করিল বটে, কিন্তু ইহাতেই যেন ঝির পেট এবারে ফুলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি শীঘ্রই একটা গুল্ম রোগ হইবার সম্ভব। ঝি বাড়ীর মধ্যে যতক্ষণ কাজকর্ম্ম করিতেছিল, ততক্ষণ বাহিরের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন সুযোগ হয় নাই ; সুতরাং রাত্রের সে ঘটনার কথা আর কাহাকেই বা বলিবে ? কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ? অমলা যখন মাথার দিব্য দিয়া সে কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার উপর ইহার জন্য তাহাকে উৎকোচ

পর্য্যন্তও দিয়াছে ; তখন ঝি কি করিয়া কাহাকেও কোন ব
না বলিয়া থাকে বল? ঝি এখন সে কথা না প্রকাশ করি
প্রাণে মারা যায়! সুতরাং ঝির কাছে অমলার মাথার দি
আর সেই টাকাটি বড়—না তাহার নিজের প্রাণ বড়—ঝি এ
বিষম সমস্যায় পড়িয়াছে। এমন সময়, গোপীনাথ বাবুর অনু
সন্ধানে যাওয়ায়—ঝির উপর বাজারে যাইবার ভার পড়িল।
কাজেই তখন ঝির এক বিষম পরীক্ষা উপস্থিত হইল।

প্রথমে ঝি, কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া, মুখ লুকাইয়া চলিয়া ছিল, এমন সময় কামিনীর মা (তার একজন ঝি) বলিল—"কিগো মাসী! আজ তুমি বাজারে চলেছ যে?"

ঝি তখন কথা না কহিয়া কিরূপে থাকিবে? বাধ্য হইয়া বলিল—"বেহারা পোড়ারমুখো বাবুকে খুঁজ্‌তে গেছে মা, তাই আমি বাজারে যাচ্ছি!"

কামিনীর মা এই কথা শুনিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু ঝির উপায় কি হইবে? সে যদি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে ঝি ধর্ম্মের দ্বারে অনায়াসে খোলসা থাকিতে পারিত। কামিনীর মাকে হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া, ঝি ডাকিল—"ও কামিনীর মা, একটা কথা শুনে যা মা। বলছিলাম কি—আমায় বল্‌তে যখন বারণ করেছে, তখন সে কথা আমার কারো কাছে বল্‌বার দরকার কি মা? বাবু রাত্তিরে মদ খেয়ে এসে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলো; কত বাতাস ক'রে—কত মুখে জল দিয়ে, তবে জ্ঞান হ'লো। তা—দিদিমণি যখন মাথার দিব্বি দিয়ে বল্‌তে বারণ করেছে, তখন সে কথা

কাকেও বল্‌বার আমার দরকার কি মা বল্‌? আমি এমন নেমক্‌হারামী কাজ কি কর্‌তে পারি—বল?"

কামিনীর মা সে কথা শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেল। তখন ঝি নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার গুল্মরোগ তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া গেল। তাহার পর সে দুইচক্ষে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই নিজে ডাকিয়া ভণিতার সহিত রাত্রির ঘটনার কথা শুনাইয়া দিল। অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য অমলা যে জল ঢালিল, অদৃষ্টের গুণে, অগ্নি-সংযোগে সে জল ঘৃত হইয়া দাঁড়াইল!
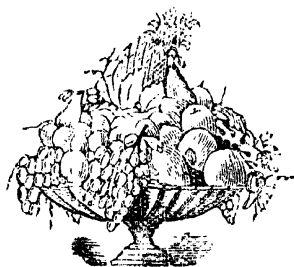
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গত রাত্রে শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে না পাইয়া হীরালাল বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। দরজা খুলিয়া হীরালালকে দেখিতে না পাইয়া শরৎকুমারীও বড়ই নিরাশ হইয়াছিল। যদি শরৎকুমারী আর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দরজা খুলিত, তাহা হইলে তাহার এরূপ মনোকষ্টের কারণ থাকিত না। কিন্তু সেদিন যে ঘটনা ঘটিবার, সেদিন সে ঘটনা ঘটিবেই—তাহার উপর কে আধিপত্য করিতে পারে?

হীরালাল বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুর নাম পরেশনাথ। ইহার পরিচয় এখন এই পর্য্যন্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বন্ধুবর সেই গভীর রাত্রে হীরালাল বাবুকে পাইয়া মহা আহ্লাদে তাঁহার সমাদর করিল, এবং সেই রাত্রে বাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া স্বয়ং কোথা হইতে এক বোতল মদ কিনিয়া আনিল। পরে উভয়ে সমস্ত রাত্রি মদ খাইয়া পৈশাচিক আমোদ আরম্ভ করিয়া দিল। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই, হীরালাল বাবু নেশায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন: আর এদিকে নেশায় উন্মত্ত হইয়া পরেশনাথ প্রতিবাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল।

তাহার পর বাড়ীর মধ্যে গিয়া স্ত্রীর উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল।

বেলা নয়টার সময় হীরালাল বাবুর নিদ্রা বা নেশাভঙ্গ হইল। প্রথম চৈতন্য হইবামাত্র তিনি যে তাঁহার চিরপরিচিত শয়নগৃহে আজ শয়ন করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কোথায় আছেন—তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না বটে; কিন্তু কিরূপে সেখানে আসিলেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে তাঁহার কিছুক্ষণ বিলম্ব হইল। প্রথমে বন্ধুর উদ্যানে নিমন্ত্রণ—সেখানে আহারাদি ও সুরাপান, তাহার পর গৃহে প্রত্যাগমন—সেখানে জননী ও ভগিনীর নিকট নিজের অবস্থা প্রকাশ প্রভৃতি একে একে সমস্ত কথাই হীরালালের মনে হইতে লাগিল। সেই পূর্ব্বস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই হীরালাল বাবুর মস্তকে যেন এক ভীষণ বজ্রাঘাত হইয়া গেল! তখন হীরালালের ভয়ানক আত্মগ্লানি উপস্থিত। সে গৃহের কেমন সুন্দর দৃশ্য দেখুন! তিনি একটা অপরিষ্কার গৃহে একখানা ছিন্ন মাদুরের উপর পড়িয়া আছেন, আর চারিদিকে বোতল গেলাস প্রভৃতি ছড়ান রহিয়াছে! সে দৃশ্য দেখিয়া, লজ্জায় ও ঘৃণায় তিনি যেন মৃতপ্রায় হইয়া গেলেন। সেখানে তিলার্দ্ধ থাকিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইল না!

তাঁহার শরীরের অবস্থাও বড় শোচনীয়। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল; মস্তকের গুরুতর যন্ত্রণায় তিনি অস্থির; আর তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, উঠিয়া দাঁড়াইবারও তাঁহার ক্ষমতা নাই। এত আনন্দ, এত স্ফূর্ত্তি, এত লম্ফঝম্ফের শেষ পরিণাম এই নাকি!

অনেক কষ্টে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু রাস্তায়

বাহির হইয়া অপরিচিত লোকের নিকটও মুখ দেখাইতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যেন গত রাত্রে তিনি কোন ভয়ানক কুকার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার মনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন; কিন্তু যখন জননী ও অমলার কথা তাঁহার মনে উদয় হইল, তখন বাড়ীর দিকে যাইতে তাঁহার আর সাহস হইল না। জননী ও অমলা যে তাঁহাকে সুরাপায়ী বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, এই কথা তাঁহার মনে উদয় হইবামাত্র, তিনি লজ্জায় ও ঘৃণায় আপনার মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এ জীবনে আর কখনও সুরা স্পর্শ করিবেন না।

হীরালাল কোন মুখ লইয়া তখন বাড়ীতে যাইবেন? কিছুক্ষণ চিন্তার পর, তাঁহার বন্ধু সুরেশ বাবুর বাড়ীতে যাইবার মনস্থ করিলেন। বেলা দশটার সময়, বিষণ্ণমনে ধীরে ধীরে সুরেশ বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। সুরেশ বাবু হীরালাল বাবুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়াই বলিলেন,—"কিহে হীরালাল, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি? কাল রাত্রে ছিলে কোথায়?"

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বেহারা গোপীনাথ, বাবুর অনুসন্ধান করিতে সুরেশ বাবুর নিকট আসিয়াছিল। সুতরাং সুরেশ বাবুর নিকট হীরালালের কোন কথা গোপন ছিল না; তিনি হীরালালকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, এবং তাঁহার একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন। হীরালাল বাবু সুরেশ বাবুর উপরোক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; কারণ,

কি উত্তর দিবেন, তখন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। সুরেশ বাবু পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"তোমার আর কোন কথা বল্‌বার আবশ্যক নেই—বল্‌লেও আমি সে কথা বিশ্বাস কর্‌বো না। তোমার চেহারা দেখেই আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। ক্রমে যে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ দেখ্‌ছি?

হীরালাল এইবার উত্তর করিলেন,—"ভাই সুরেশ, আমায় মাপ কর, আমি এমন কর্ম্ম আর কখন করবো না।"

সুরেশ। এ কথাটা আন্তরিক কথা, না মুখের কথা?

হীরালাল। এ আমার আন্তরিক কথা।

সুরেশ। হীরালাল, তোমার অনেক গুণ। সে সকল গুণের কথা মনে হ'লে, তোমায় দেবতার ন্যায় পূজা করতে ইচ্ছা করে; কিন্তু এক দোষে তোমার সেই সমস্ত সদ্গুণ মাটী হয়ে যাচ্ছে।

হীরালাল। সুরেশ, আমি সব বুঝি, আমি সব জানি; তবে আমার মনোকষ্টের কথা তুমি বুঝ্‌তে পার না, এই আমার দুঃখ।

সুরেশ। আচ্ছা, আমি স্বীকার কর্‌লুম্—তোমার স্ত্রী বড় মুখরা, তাঁর যথার্থ পতিভক্তি নেই, তুমি তাঁর প্রণয়ে সুখী নও; তা ব'লে কি, তুমি তাঁর উপর রাগ ক'রে নিজে অধঃপাতে যাবে? এ যে তোমার চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া হচ্ছে, দেখ্‌তে পাই। তোমার এই দোষের জন্য তোমার অন্যান্য আত্মীয়বন্ধু কিরূপ দুঃখিত, তা তুমি জান না।

হীরালাল। সুরেশ, আমার প্রাণের কথা আমি সব বলেছি। আমার স্ত্রী আমার মনোমত হয়নি, আমি বিবাহের

পূর্ব্বে যে সুখের আশা করেছিলুম্, সে আশায় সম্পূর্ণ নৈরাশ হয়েছি, প্রাণেও একটা ভয়ানক আঘাত পেয়েছি। আমার কষ্টের কথা তোমায় কি বল্‌বো? যখন মদের প্রতি আমার ভয়ানক ঘৃণা ছিল, তখন আমার স্ত্রী আমায় মাতাল বলে ঘৃণা কর্‌তো। বিনাদোষে স্ত্রীর এরূপ ঘৃণিত হ'য়ে থাকা কিরূপ কষ্ট-কর, ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ তা বুঝ্‌তে পারে না। মদ যে শরীর ও মন উভয়ের পক্ষে ভয়ঙ্কর অনিষ্টকর, তা আমি জানি। তবে মদের এক গুণ আছে; আমি যখন মদ খাই, তখন আমার এ অসহ্য যন্ত্রণাও ভুলে যাই। আজ যে তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম, সে আমার নিজের ভালর জন্য নয়, সে আমার স্ত্রীর মুখ চেয়েও নয়, সে কেবল আমার জননীর মুখ আর সরলা অমলার মুখ চেয়ে। তাঁদের কাছে কাল্ রাত্রে আমি বড় লজ্জিত হয়েছি। আর আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তাঁরা আমার এই ব্যবহারে বড়ই মনোকষ্ট পেয়েছেন। আজ ঘৃণায় আমার আত্মঘাতী হ'তে ইচ্ছে কর্‌ছে।

এই কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে, হীরালালের চক্ষে অশ্রু-বিন্দু দেখা দিল। সুরেশ সেই অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিয়া বন্ধুকে আলিঙ্গন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় সুরেশ বাবু, হীরালালকে বাড়ী রাখিয়া গেলেন, এবং হীরালাল বাবুর জননীকে গোপনে ডাকিয়া কি কথা বলিলেন। গতরাত্রের ঘটনা-সম্বন্ধে কেহ কোন কথার আর উল্লেখ করিল না; হীরালালও কাহারও সহিত কোন প্রকার কথাবার্ত্তা কহিলেন না, নিজগৃহে সে দিন চোরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গৃহিণী সন্ধ্যার পর হইতে একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। শরৎকুমারী যত্নের সহিত স্বামীর আহারাদির সমস্ত উদ্যোগ স্বহস্তে করিল বটে, কিন্তু আজ আর স্বামীকে আহার করাইবার জন্য তাঁহার সম্মুখে যাইতে কোন মতেই স্বীকৃত হইল না। অমলা যত্নের সহিত ভ্রাতাকে আহার করাইল। সে সময় অন্যদিনের ন্যায় ভ্রাতার সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়াও, অমলা তাঁহার মনের কষ্ট গোপন করিতে লাগিল। যেন এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে তাহার দাদার প্রতি পূর্ব্বভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হইতে পারে। অমলার নির্ম্মল হৃদয়ে কখনও মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে না।

আহারাদির পর হীরালাল শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। হীরালালের পূর্ব্বেই শরৎকুমারী সে শয্যায় শয়ন করিয়াছিল।

সে রাত্রে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইল না। শরৎকুমারী হীরালালকে দেখিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল মাত্র, হীরালালও পত্নীর বিপরীত-দিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শরৎকুমারী কিন্তু শয্যায় পড়িয়া সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রা যাইতে পারে নাই।

প্রভাতে যখন হীরালাল বাহিরে আসিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার একজন প্রতিবাসী তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালাল সেই প্রতিবাসীকে বিশেষ সম্মান করিতেন, এবং তিনিও তাঁহার বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। প্রতিবাসী অন্যান্য দুই-একটি কথাবার্ত্তার পর আরম্ভ করিলেন,—"বাবা হীরু, তোমার সম্বন্ধে একটা কথা শুনে আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে; কথাটা এত ভয়ানক যে, হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।"

হীরালালের মাথায় যেন একটা বজ্রাঘাত হইল! কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; নীরবে অবনত-মস্তকে বসিয়া রহিলেন। প্রতিবাসী পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"তোমার মতন ছেলে ত আজকের কালে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; তবে কেন যে তোমার নামে এমন বদনাম উঠলো—তা'ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

হীরালাল এইবার ধীরে ধীরে বলিলেন—"কি বদনাম শুনেছেন কাকা?"

প্রতিবাসী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"তুমি নাকি ভয়ানক বেশ্যাসক্ত হয়েছ, রাত্রে একদিনও বাড়ী থাক না, বাড়ী এলেও নাকি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ী আস?"

প্রতিবাসীর মুখে এরূপ কলঙ্কের কথা শুনিয়া, হীরালাল প্রথমে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন —"আপনি একথা কার মুখে শুনলেন?"

প্রতিবাসী উত্তর করিলেন—"কথাটা আমাদের কামিনীর মা ঝির মুখে আমি শুনেছি বটে, কিন্তু সে ঐ কথা তোমাদের ঘরের লোকের মুখেই শুনে গেছে।"

তখন এই ঘরের লোক যে কে—তাহা হীরালালের জানিতে আর বাকী রহিল না; তৎক্ষণাৎ অনুমান করিলেন—এ ঘরের লোক এক শরৎকুমারী ভিন্ন আর অন্য কেহই হইতে পারে না। শেষে সেই অনুমান দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল। তখন হীরালাল এইরূপ অযথা কলঙ্ক-রটনায়, শরৎকুমারীর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; স্বপক্ষে কোন কথা বলিয়া সে কলঙ্ক মোচনের কোন চেষ্টাই করিতে পারিলেন না। প্রতিবাসীর শেষ উপদেশ হইল—"বোধ হয় কুসংসর্গে পড়ে তুমি খারাপ হয়ে গিয়েছ। তা বাপু, এইবেলা সাবধান হও; তোমার মাথার উপর কেউ নাই বলেই আমি একথা বল্‌ছি।"

হীরালালের মুখে আর কথা নাই! শরৎকুমারীর উপর ইহার প্রতিশোধ কিরূপে লইবেন, তখন সেই চিন্তায় তিনি ব্যস্ত। হতভাগিনী শরৎকুমারী কিন্তু ইহার কিছুই জানে না! ইহার মূল সেই—'ন্যাকাউন্টা ঝি-মাগী'। তাহার পর কামিনীর মা নানা শাখা প্রশাখা দিয়া এইরূপ রটাইয়াছে। স্ত্রী-চরিত্র বুঝিবার ক্ষমতাত দেবতাদিগের নাই, আর স্ত্রীলোকের মধ্যে ঝি চরিত্র বুঝিবার ক্ষমতা বোধ হয়, দেবাদিদেব মহাদেবেরও নাই!

নবম পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমারীর উপর হীরালাল বাবুর ক্রোধ উপরোক্ত ঘটনায় বদ্ধমূল হইয়া গেল; সুতরাং হীরালাল স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে স্বামীর এইরূপ ব্যবহারে শরৎকুমারীর অভিমানের মাত্রাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও শরৎকুমারী সে অভিমানের মাত্রা হ্রাস করিতে পারিল না। শরৎকুমারীর একান্ত ইচ্ছা, যাহাতে স্বামীর সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য না থাকে; কিন্তু স্বামী যখন বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তখন মানিনী শরৎকুমারী আর কি করিতে পারে? শরৎকুমারীর অভিমানের কারণও যথেষ্ট ছিল, সুতরাং সে বিষয়ে আমরা তাহাকে দোষী করিতে পারি না। হীরালাল বাবুর যেরূপ মনের বিশ্বাস, তাহাতে শরৎকুমারীর প্রতি তাঁহার ক্রোধের কারণও যথেষ্ট আছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাঁহাকেই বা দোষী করি কিরূপে? তবে এ বিষয়ে দোষী কে? অনেক সময় ঘটনাচক্রে পড়িয়া এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে গোলযোগ হইয়াছিল, তাহা আর মিটিল না। এদিকে

হীরালাল কিন্তু নিয়মিত সময়ে কার্য্যালয়ে যাইয়া থাকেন, এবং নিয়মিত সময়েই কার্য্যালয় হইতে বাড়ী ফিরিয়া আইসেন। কোন বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান না। সন্ধ্যার পরেই যে, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, সে অভ্যাসও এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন। হীরালালের মনে কিন্তু সুখ ছিল না, তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে থাকিতেন। মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলে, সে দুঃখেরও অনেক লাঘব হয়—হীরালাল বাবুর সে সুযোগও ঘটিয়া উঠে নাই, সুতরাং তাঁহার দুঃখভার ক্রমেই গুরুতর হইতে লাগিল। তাঁহার অন্যান্য বন্ধুর মধ্যে সুরেশ বাবুর সহিত তিনি একত্র এক আফিসে কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং প্রত্যহই উভয়ের সাক্ষাৎ হইত, তথাপি হীরালাল তাঁহাকেও সে মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। তাঁহার কলঙ্কের কথা যে তাঁহারই স্ত্রীর দ্বারা অন্যায়রূপে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রতিবেশীমহলে প্রচারিত হইয়াছে—সে কথা তিনি তাঁহার প্রাণের বন্ধু সুরেশ বাবুর নিকট প্রকাশ করিতেও লজ্জাবোধ করিতে লাগিলেন যখন হীরালালের অবস্থা এইরূপ, তখন এক দিন কার্য্যালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে পরেশনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পরেশনাথ হীরালাল বাবুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"কি হে—তোমার ব্যাপারখানা কি? আর দেখা নাই যে? সন্ধ্যের পর আর আমাদের বাসায় আস না কেন? কোন অপরাধ করেছি নাকি?"

হীরালালের বড় চক্ষুলজ্জা। তিনি মনে মনে পরেশনাথকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন, কিন্তু মুখে কোন কথা বলিতে পারিতেন

না। তিনি বলিলেন—"তোমার আবার অপরাধ কি? আমার মনের অবস্থা ভাল নয়, তাই সন্ধ্যের পর আর কোথাও যাই না।"

পরেশনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"মনের অবস্থা ভাল নয় বলে, কি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে নেই?"

হীরালাল।—আরো একটু কারণ আছে, আমি প্রতীজ্ঞা করেছি, যে মদ আর স্পর্শ করবো না।

পরেশনাথ পুনরায় হাসিয়া বলিল—"তা বেশ্ করেছ তবে একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস্ করি—এ প্রতীজ্ঞাটা কেন করা হলো?"

হীরালাল।—বড় দুর্নাম রটেছে, এতদিন কথাটা কেউ জানতো না, এখন অনেকেই জেনেছে।

পরেশ।—যদি দুর্নামেরই এত ভয় ছিল, তবে কথাটা প্রকাশ হ'বার পূর্ব্বেই প্রতীজ্ঞাটা করলে ভাল হতো। যখন অনেকেই জেনেছে, তখন আর ভয় কিসের? আর এক কথা এতে দুর্নামই বা কি? আজকাল মদ কেনা খায়?

হীরালাল।—অনেকে খেলেও—যারা খায়, লোকে তাদের নিন্দে ভিন্ন প্রশংসা আর কে করে বল?

পরেশ।—যারা নিন্দে করে, তারাই আবার গোপনে গোপনে মদ খেয়ে থাকে; নিন্দে করা যাদের স্বভাব, তারাই নিন্দে করে—ভাল লোকে কখনই নিন্দে করে না। আমি ত নামকাটা সেপাই, কারু নিন্দেতে ভয় করি না বাবা।

হীরালাল।—তুমি আর কাকে ভয় করবে? তোমার ভয়ে সকলেই অস্থির। আমার মতন তোমার মা নেই ভগিনী

নেই, আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই, তবে আর কাকে ভয় করবে ?

পরেশ। তুমিও ত আর ছোট ছেলেটি নও, যে মা, বোন, আত্মীয়-স্বজনকে ভয় করে চল্‌বে। পরিশ্রম করে টাকা রোজকার করছো, তাদের সকলকে প্রতিপালন করছো, আর নিজের আয়েস কিছু করবে না বাবা ? তুমি ত তোমার স্ত্রীর দু'চক্ষের বিষ! তোমার সংসারে তোমার সুখ কি ? তবু দু'দণ্ড বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে আমোদ আহ্লাদ কর, সেই ত তোমার সুখ। এ সুখ ও যদি ছেড়ে দাও, তবে কি সুখে এ সংসারে থাকবে বাবা ?

এতক্ষণের পর পরেশনাথের কথাটা হীরালাল বাবুর মনোমত হইল। তিনিও যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। হীরালাল তখন মনে মনে ভাবিলেন—"বাস্তবিক এ সংসারে আমার সুখ কি ? এই যে সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘরে যাচ্ছি—সেখানে গিয়েই বা কি সুখ পাব ?"

হঠাৎ এই সময় কিন্তু সেই স্নেহময়ী জননী আর ভক্তিমতী সহোদরার কথা হীরালালের মনে উদয় হইল! সেই স্নেহময়ী জননী আর সেই ভ্রাতৃগতপ্রাণা অমলার অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসায় কি হীরালালের সুখ নাই ? হীরালাল বাবুর মন পরেশনাথের কথায় যত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ ততদূর যেন ফিরিয়া আসিল। তিনি যে কথা পরেশনাথকে বলিতে যাইতেছিলেন—সে মুখের কথা তাঁহার মুখেই রহিয়া গেল। তিনি তখন মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরেশনাথ পুনরায় আরম্ভ করিল—"তোমার মন খারাপ হয়েছে বল্‌ছো, তা যে তোমার বাঘিনী স্ত্রী ঘরে আছে, তাকে

ঘরে বসে থাক্‌লে কি আর তোমার মন ভাল হবে ? মন খারাপ হয়ে থাকে, মন যাতে ভাল হয়, তাই কর। আচ্ছা ভাই, মদের চেয়ে মনকে ভাল কর্‌বার আর অন্য ওষুধ কিছু আছে কি ?"

পরেশনাথের এ প্রশ্নে হীরালালের সে চিন্তা কোথায় চলিয়া গেল। হীরালাল উত্তর করিলেন—"অল্পমাত্রায় খেলে, মন প্রফুল্ল হয় বটে।"

পরেশনাথ এই বার তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"আচ্ছা বেশ—অল্পমাত্রাতেই খাবে। তুমি বেশী কেন খাও ?"

হীরালালের মনের গোড়া কেমন আলগা হইয়া গিয়াছিল; অগ্রগামী মন পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া আসিলেও, সেখানে অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। হীরালাল যেন একটা বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পরিলেন না। এতক্ষণ তিনি পরেশনাথের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতে ছিলেন, এইবার যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, সে স্থান হইতে দুই দিকে দুইটী রাস্তা গিয়াছে। এক দিকে হীরালাল বাবুর বাড়ী যাইবার রাস্তা, আর তাহার ঠিক বিপরীত দিকে পরেশনাথের বাসায় যাইবার রাস্তা। পরেশনাথ এইবার বলিল—"এস—এখন আর বাড়ী গিয়ে কি করবে ? আমাদের বাসায় একবার বেড়িয়ে যাবে, চল।"

পরেশনাথের বাসায় বেড়াইতে যাইবার অন্য একটা অর্থ ছিল; সুতরাং হীরালাল তখন কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, দুই পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হীরালালকে এইরূপ চিন্তিত দেখিয়া পরেশনাথ তাঁহার হাত ধরিয়া টানিল। তখন অগত্যা স্রোতমুখে পতিত তৃণের ন্যায়

হীরালাল ভাসিয়া চলিলেন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাশক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার আর রহিল না। হীরালালকে বাসায় লইয়া গিয়া পরেশনাথের আনন্দের সীমা ছিল না। অপহৃত রত্ন ফিরিয়া পাইলেও লোকের এত আনন্দ হয় না!

এ সংসারে কুসংসর্গই সকল সর্ব্বনাশের মূল। তাহার প্রলোভনে জয়ী হওয়া দুর্ব্বল মনুষ্যের সাধ্যাতীত। মানুষ যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যতই ধর্ম্মভীরু, যতই শিক্ষিত হউক না কেন, একবার কুসংসর্গে পড়িলে তাহার আর রক্ষা নাই। যদি পৃথিবীতে সুনাম রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে সৎসংসর্গরূপ ধ্রুবতারার প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিয়া এ সংসারসাগরে জীবনতরি ভাসাইতে হইবে। একবার পাপের সংসর্গে পড়িলে সহজে আর সে সংসর্গ ত্যাগ করা যায় না। হায়! সংসারের মানুষ কি এতই দুর্ব্বল—এতই অপদার্থ? তবে সে মানুষের আবার কিসের দর্প—কিসের অহঙ্কার—কিসের গর্ব্ব?

দশম পরিচ্ছেদ।

আমরা এইবার পরেশনাথের পরিচয় দিব। পরেশনাথের সকল পরিচয় আমরাও জানি না; তবে যে পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই আমরা এস্থলে প্রকাশ করিব। বর্দ্ধমানের সন্নিকটে যে গ্রামে পরেশনাথের নিবাস, সে গ্রামের নাম আমরা জানি না; তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে—যে গ্রামে পরেশনাথের গৃহ বা বিষয়-সম্পত্তি ছিল, এখন আর তাহার সহিত পরেশনাথের কোন সম্পর্কই নাই। পরেশনাথ সে সমস্তই বিক্রয় করিয়া গ্রামের সহিত সকলসম্পর্ক লোপ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং সে গ্রামের অনুসন্ধান করিবার এখন আর কোন আবশ্যক দেখি না।

পূর্ব্ববাঙ্গালার একজন জমীদারের সরকারে পরেশনাথ পূর্ব্বে চাক্‌রী করিত। আজ ছয় বৎসর হইল, পরেশনাথের সে চাক্‌রীও গিয়াছে। পরেশনাথ বিনা দোষে কর্ম্মচ্যুত হয় নাই; যে গুরুতর অপরাধে তাহার কর্ম্ম যায়, মাত্র সে কর্ম্ম যাওয়ায়—পরেশনাথ আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিল। তাহার পর পরেশনাথ কলিকাতায় আসিয়া চাক্‌রীর উমেদারী করে, কিন্তু কলিকাতায় কোনরূপ চাক্‌রী না হওয়ায়, পরেশনাথ এখন দালালী-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। জমীদারী সরকারে অনেক দিন চাক্‌রী

করায়,সকল প্রকার আদালতের কার্য্য পরেশনাথের বিলক্ষণ জানা ছিল, সেই কারণ কলিকাতায় আসিয়া মোকর্দ্দমার তদ্বিরের দ্বারাও পরেশনাথ অনেক সময় বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিত। আর দালালী-কার্য্যের মধ্যে হ্যাণ্ডনোট ও 'কাপ্তেন বাবুর' দালালী ভিন্ন অন্যরূপ দালালীতে পরেশনাথের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। তবে দশ টাকা উপার্জ্জন হইবার আশা থাকিলে, পরেশনাথ সকল প্রকার দালালীর কার্য্যই করিত। এমন কি সময়ে সময়ে ঘটকালী করিতেও আমরা পরেশনাথকে দেখিয়াছি। মোটের উপর পরেশনাথের উপার্জ্জন মন্দ ছিল না। তবে কখন কখন অর্থের জন্য তাহাকে অনেক কষ্টও পাইতে হইত, এমন কি কোন কোন দিন অর্থাভাবে আহার পর্য্যন্তও হইত না। আবার পরেশনাথ যখন একটা দাঁও মারিত, তখন তাহার ধুমধাম দেখে কে? যতদিন সে টাকা একবারে নিঃশেষ না হইত, ততদিন পরেশনাথ অর্থ উপার্জ্জনের কোন চেষ্টাই করিত না। অর্থের অনাটন পড়িলে জাল জুয়াচুরী, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতেও পরেশনাথের বিশেষ অভ্যাস ছিল। সে সময় দুই চারি টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও পরেশনাথ প্রস্তুত থাকিত। ফলতঃ, যে কোন উপায়ে হউক, পরেশনাথের অভাব মোচন হইলেই হইল, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি তাহার কোন লক্ষ্যই ছিল না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, এত উপার্জ্জনেও পরেশনাথের অভাব ঘুচিত না কেন? তাহার প্রধান কারণ—পরেশনাথ ভয়ানক সুরাপায়ী ছিল, আর স্বচ্ছল অবস্থায় আহার-পরিচ্ছদ প্রভৃতি জুয়াখেলিতেও পরেশনাথ বে-হিসাবী খরচ করিত। অর্থ থাকিলে

কিরূপে সেই অর্থের অপব্যয় করিবে, পরেশনাথ তখন কেবল সেই চেষ্টায়ই ফিরিত। ফল কথা—অধর্ম্মের অর্থ এইরূপেই অপব্যয় হইয়া থাকে।

পরেশনাথের পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, দশ বৎসরের এক কন্যা আর ছয় মাসের এক পুত্র। পরেশনাথের অত্যাচারে তাহার বাসায় দাসদাসী অধিক দিন থাকিতে পারিত না, সর্ব্বদাই দাসদাসীর পরিবর্ত্তন ঘটিত। আবার অনেক সময় কোন দাসদাসী আদৌ থাকিত না। পরেশনাথের স্ত্রী নিস্তারিণী স্বহস্তেই সমস্ত গৃহকার্য্য করিত; তাহার বালিকা কন্যা সুখদাও এই বয়সে সমস্ত গৃহকর্ম্ম শিখিয়াছিল। নিস্তারিণী স্বামীর এত অত্যাচার সহ্য করিত যে, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। পরেশনাথ প্রতিদিন সুরাপান করিত, আর সুরাপান করিয়া তাহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য ছিল—নিস্তারিণীকে প্রহার করা! সে প্রহারও সহজ প্রহার নয়, সময়ে সময়ে সে প্রহারে নিস্তারিণীর জীবন সঙ্কট পর্য্যন্ত হইত। পরেশনাথের বালিকা কন্যা সুখদাও পিতার অনেক অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত। তবে কেবল মত্ততা অবস্থাতেই পরেশনাথের এই সকল অত্যাচার ছিল; স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ কিছুই ছিল না।

এখন পরেশনাথের সহিত হীরালাল বাবুর বন্ধুত্ব কিরূপে হইল, আমরা এইবার তাহা প্রকাশ করিব। পরেশনাথ প্রথম কলিকাতায় আসিয়া যখন চাকরীর উমেদারী করে, সেই সময় হীরালাল বাবুর সাহেবের জমিদারী কার্য্যাদক্ষ এরূপ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হয়; পরেশনাথ সন্ধান লইয়া হীরালাল বাবুর সহিত এই সময় আলাপ করে, এবং তাঁহাকে সাহেবের একজন প্রিয়পাত্র

জানিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া বসে। পরেশনাথ যে জমিদারী-কার্য্যে বিশেষ উপযুক্ত, তখন হীরালাল বাবুর মনে এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছিল। হীরালাল পরেশনাথের চাকুরীর জন্য সাহেবকে অনুরোধ পর্য্যন্ত করেন। সাহেবও পরেশনাথকে চাকুরী দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তবে উপযুক্ত জামিন দিতে অক্ষম হওয়ায়, তাহার সে চাকুরী হয় নাই। সে সময় পরেশনাথের এরূপ চেষ্টা ছিল যে হীরালাল বাবুকেই তাহার জামিনের স্থল ভিষিক্ত করিবে; হীরালালের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে তিনিও ইহাতে অস্বীকার ছিলেন না; তবে কেবল তাঁহার বন্ধু সুরেশ বাবুর অনুরোধে শেষে তিনি একজন অপরিচিত বন্ধুর জামিন হইতে স্বীকৃত হইলেন না।

পরেশনাথ কিন্তু হীরালাল বাবুকে চিনিতে পারিয়াছিল; এরূপ পরোপকারী সরলপ্রকৃতির লোকের দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক কার্য্যোদ্ধার হইতে পারিবে মনে করিয়া, পরেশনাথ বন্ধুত্বের ভিত্তি ক্রমে দৃঢ় করিতে আরম্ভ করিল। এই কলিকাতায় হীরালাল বাবুর সহিত অনেক বড়-লোকেরও বন্ধুত্ব ছিল, সুতরাং পরেশনাথের বিষয়-কার্য্যসম্বন্ধে অনেক সময় অনেক সাহায্যও হীরালাল বাবু করিতেন। ইহা ব্যতীত অর্থের অনাটনেও পরেশনাথ-সম্বন্ধে হীরালাল মুক্তহস্ত ছিলেন। সুতরাং এরূপ একটা উত্তম শিকার পরেশনাথ কি সহজে ছাড়িতে পারে? তবে সত্যের অনুরোধে আমরা এই কথা বলিতে বাধ্য যে, পরেশনাথ হীরালালের একজন প্রাণ অসাকাঙ্ক্ষী বন্ধু যে, অন্যে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিলে, তৎপ্রতিবিধানে পরেশনাথ

প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইত। তবে নিজের স্বার্থের জন্য বন্ধুর মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখা পরেশনাথের কুষ্ঠিতে কখন লেখে নাই। সেই কারণ, আপনার কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে পরেশনাথ কাহারও শুভাশুভ দেখিতে বাধ্য ছিল না। হীরালালের অসাধারণ গুণই অনেক সময় তাঁহার দোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। সেই কারণেই হীরালাল এই অসাধারণ বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

হীরালাল যে সুরাপায়ী হইয়াছিলেন, তাহার মূলও এই পরেশনাথ। আমরা হীরালালকে যেরূপ সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান বলিয়া জানি, তাহাতে কেবল শরৎকুমারীর নির্ব্বুদ্ধিতাই হীরালালের অধঃপতনের কারণ নয়। পরেশনাথের কৌশলজালে আবদ্ধ হইয়া, হীরালাল শরৎকুমারীর হৃদয়নিহিত গভীর প্রণয়ের কোন অনুসন্ধান লইতেন না। পরেশনাথ তাহার স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিত, সে পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এহেন বন্ধুর সহবাসে শরৎকুমারী তাহার স্বামীর নিকট আর অধিক কি আশা করিতে পারে?

একাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষ যতই কেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও গুণবান্ হউক না, একবার পদস্খলন হইলে আর তাহার রক্ষা নাই! হীরালালের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি যখন কলেজে পড়িতেন, তখন তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণের কোন বিষয় পরামর্শ করিতে হইলে, সকলেই হীরালালবাবুর নিকটই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ন্যায় দয়ালু, পরোপকারী ও মিষ্টভাষী লোক অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হায়! সেই হীরালালের একবার পদস্খলনের পর আর উত্থান-শক্তি নাই!

প্রতিজ্ঞা করিয়াও, হীরালালের সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না! তিন দিন যাইতে না যাইতে হীরালাল সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বসিলেন! এমন কোন ঘটনাই ঘটে নাই, যাহাতে এরূপ লোকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে পারে। একজন জঘন্য প্রকৃতির লোক—যাহাকে হীরালালও মনে মনে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহারই অনুরোধে, হীরালালের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল! আমরা সেই কারণেই বলিতেছিলাম, মানুষ যতই কেন উন্নত হউক না, একবার অবনতি আরম্ভ হইলে আর তাহার রক্ষা নাই!

পাপের এমনি মোহিনীশক্তিই বটে! পরেশনাথ একবার অনুরোধ করিল, আর হীরালাল অমনি হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তিবিহীন হইয়া পরেশনাথের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পরেশনাথের এ অনুরোধ রক্ষা না করিলে হীরালালের কি ক্ষতি হইত? হীরালালের প্রতীজ্ঞার মূল্য এইবার বুঝিতে পারা গেল। হীরালালের আকাঙ্ক্ষা-বহ্নি তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত ছিল; পরেশনাথের একটি ফুৎকারে তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। হীরালাল তাঁহার কুপ্রবৃত্তি দমনের আর কোন চেষ্টা করিলেন না; জননীর স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা, তখন কোথায় ভাসিয়া গেল। হীরালাল পরেশনাথের সঙ্গে তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে সময় হীরালালের কোনরূপ স্ফূর্ত্তি ছিল না; একটা দুষ্কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, হীরালাল বাবুর মনের অবস্থাও তখন সেইরূপ। তাহার পর স্ফূর্ত্তিদায়িনী সুরেশ্বরীর প্রসাদে তাঁহার বিষণ্ণমন ক্রমে প্রফুল্ল হইতে লাগিল। তবে এবার হীরালাল অতি সাবধানে অল্প-পরিমাণ গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। পরেশনাথের ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না; বরং ইহাতে নিজ-অংশের পরিমাণ অধিক হইবে মনে করিয়া পরেশনাথ সন্তুষ্ট। তবে সে যে হীরালালকে অধিক পরিমাণে পান করাইবার জন্য অনেক সময় অনুরোধ করিত, তাহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, হীরালালই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন, উন্মত্ততা না জন্মিলে, হীরালাল অকাতরে অর্থব্যয় করিবেন কেন? আজ কি ভাবিয়া, পরেশ-নাথ অল্পে অল্পেই হীরালালকে অব্যাহতি দিল; সুতরাং এদিকেও

নিজে অধিকমাত্রায় পান করায় তাহার উন্মত্ততা অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছিল। উন্মত্ততা বৃদ্ধি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে পরেশনাথের পৈশাচিক ক্রিয়ারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুরাপান করিয়া পরেশনাথ এরূপ জঘন্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল যে, হীরালাল তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

যে ব্যক্তি যে প্রকৃতির লোক, উন্মত্ত অবস্থায় তাহাকে দেখিলেই তাহার সে প্রকৃতি অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তখন আর তাহার চরিত্রের উপর কোন আবরণ থাকে না; চক্ষুলজ্জা, লোকলজ্জা প্রভৃতি কোনরূপ লজ্জা-ভয়ও তাহার আর নাই; সুতরাং এই সময় তাহার প্রকৃতি বুঝিতে আর অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। ইতর-শ্রেণীর লোকে এই জন্য সুরাপান করিয়া কিরূপ জঘন্য ব্যবহার করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কোন কোন শিষ্টশান্ত ভদ্রলোকও এই কারণ উন্মত্তাবস্থায় ইতর-শ্রেণীর লোক অপেক্ষাও অতি জঘন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরেশনাথের প্রকৃতি আমাদের জানিতে বাকি নাই; পরেশনাথ উন্মত্তাবস্থায় প্রথমেই ইতর-ভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। তাহার পর আর সে গৃহের মধ্যে থাকিতে পারিল না; রাস্তায় বাহির হইয়া অশ্লীল ভাষায় প্রতিবাসীদিগকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। সে পাড়ায় কয়েক ঘর নিরীহ ভদ্রলোকের বাস ছিল। তাহারাই পরেশনাথের "ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলো।" এদিকে পরেশনাথ কিন্তু উন্মত্ত হইলেও, নিরীহ প্রকৃতির লোক দেখিয়া অত্যাচার করিত।

এই সময় রাস্তা দিয়া একজন বলবান্ যুবক যাইতেছিল। ভদ্রলোকদিগের প্রতি পরেশনাথের এরূপ ভয়ানক অত্যাচার

দেখিয়া, যুবক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে অত্যাচার নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। সেই কারণ, পরেশনাথের সহিত তৎক্ষণাৎ তাহার বিরোধ উপস্থিত হইল এবং সে বিরোধে পরেশনাথের লাভ হইল বিলক্ষণ প্রহার!

যুবকত প্রহার করিয়া প্রস্থান করিল। সে প্রহারটাও কিছু গুরুতর হইয়াছিল। কিন্তু সে অপরিচিত যুবক চলিয়া গেলে পর, পরেশনাথের বিক্রম দেখে কে? পাড়ার সেই নিরীহ ভদ্রলোকদিগের উপরই এখন তাহার বিশেষ জাতক্রোধ! তাহারা পরেশনাথের ভয়ে সদরবাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার অত্যাচার সকলেই নীরবে সহ্য করিতেছিল, তাহার কটু কথার বিপক্ষে কেহ একটিও দ্বিরুক্তি করে নাই। এই সকলের ফল হইল কি জান? ফল আবার কি হইবে—তাহাদেরই উপর অতি জঘন্য ভাষায় পরেশনাথের অজস্র গালিবর্ষণ যে সহ্য করে, তাহার সহ্যের তখন আর সীমা থাকে না!

কিন্তু ইহাতেও সে প্রহারের জ্বালা পরেশনাথের নিবারণ হইল না। তখন কাহাকেও স্বহস্তে প্রহার না করিলে, আর সে জ্বালা নিবারণ হইবে না, ইহাই পরেশনাথের দৃঢ় বিশ্বাস। প্রহার আর কাহাকে করিবে? রাস্তায় তখন বহুলোকের সমাগম হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এক জন ভদ্রলোকের এরূপ ব্যবহারে ইতর-ভদ্র সকলেরই মুখে বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইতেছিল। রাস্তায় কোন লোককে প্রহার করিলে তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে যে তাহার ফল ফলিবে, পরেশনাথ অজ্ঞানাবস্থাতেও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। আর অন্যকে প্রহার করা দূরে থাকুক, রাস্তার

লোকে ক্রমে যেরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে পরেশনাথ যে তাহাদের দ্বারাই শীঘ্রই প্রহারিত হইবে, সে বিশ্বাস তখন তাহার মনে হঠাৎ উদয় হইয়াছিল। সুতরাং অগত্যা পরেশনাথ নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া, বাহিরের সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, পরেশনাথ অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অল্পক্ষণ পরেই পরেশনাথের অন্দরের মধ্য হইতে একটা ভয়ানক আর্ত্তনাদ উঠিল। তাহার স্ত্রী নিস্তারিণী ও তাহার বালিকা কন্যা সুখদার আর্ত্তনাদে অকস্মাৎ চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। উন্মত্তাবস্থায় পরেশনাথ যখন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তাহার স্ত্রী নিস্তারিণী রন্ধনকার্য্যে নিযুক্তা, আর তাহারই কন্যা সুখদা—জননীর সেই কার্য্যের সাহায্যকারিণী। পরেশনাথের অবস্থা দেখিয়া তাহাদের প্রাণ একবারে উড়িয়া গেল মাতা কন্যাকে দূরে পলায়ন করিবার অনুরোধ করিল, কিন্তু কন্যা মাতাকে ফেলিয়া অন্যত্রে যাইতে সম্মত হইল না। পরেশনাথ রন্ধনগৃহে দৌড়িয়া গিয়া আরম্ভ করিল—"কৈ—কি রান্না হয়েছে দেখি?"

নিস্তারিণীর মুখে আর কথা নাই! কারণ তখনও তাহার রন্ধনকার্য্য শেষ হয় নাই। পরেশনাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"কি! এখনও রান্না হয়-নি?"

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বলিল—"ভাত হয়েছে—ডালও হয়েছে—এই মাছের তরকারীটে হ'লেই হয়। একটু দেরী কর, আমি শীগ্‌গির রেঁধে দিচ্ছি।"

পরেশনাথ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল—"কি হারামজাদী ! আমি দেরী করবো ? আমি কি তোর গোলাম ? অাবি হামারা ভাত লে-আও।"

নিস্তারিণী স্বামীর স্বভাব জানিত। এরূপ মত্ততাবস্থায় আজ্ঞা-প্রতিপালনে বিলম্ব করিলে, নিশ্চয় তাহার জীবন-সঙ্কট। ভাত ও ডাল যাহা প্রস্তুত ছিল, তাড়াতাড়ি নিস্তারিণী স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া দিল। সে ভাত ও দাল দেখিয়া, পরেশনাথ একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ; মুখে একটিও কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ চুলের ঝুঁটি ধরিয়া স্ত্রীকে দুই তিনবার সজোরে পদাঘাত করিল। সে প্রহারে নিস্তারিণী একটা ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। জননীকে ঐরূপ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, সুখদার প্রাণ স্থির হইবে কেন ? সুখদাও তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং দৌড়িয়া গিয়া মাতার চক্ষে ও মুখে জল দিয়া তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল। সুখদা এইরূপ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করায় বিশেষতঃ জননীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হওয়ায়, তাহার নিষ্ঠুর পিতার ক্রোধ তখন ভীষণবেগে কন্যার উপর পড়িল। এইবার পরেশনাথ সুখদাকেও অতি নিষ্ঠুর রূপে প্রহার আরম্ভ করিল। বালিকা সুখদা, পশুবৎ উন্মত্ত পিতার সে প্রহার সহ্য করিবে কিরূপে ? সুতরাং সুখদা আরও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। নিস্তারিণী স্বামীর প্রহার বরাবর নীরবে সহ্য করিত, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের অধিকারও তাহার ছিল না ; কিন্তু তাহার স্নেহের কন্যা সুখদাকে অন্যায়রূপে প্রহারিত হইতে দেখিয়া, মায়ের প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে ? নিস্তারিণীও উচ্চৈঃস্বরে

চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন কাজেই মাতা ও কন্যার আর্ত্তনাদে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল।

নরাধম পরেশনাথের ইহাতেও ক্রোধের শান্তি হইল না। স্ত্রী ও বালিকা কন্যার ক্রন্দনে সে পাষাণহৃদয় কিছুমাত্র ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক, পরেশনাথ তখন উন্মত্তাবস্থায় সেই অন্নব্যঞ্জন-পূর্ণ থাল দূরে নিক্ষেপ করিল। ভীষণ শব্দের সহিত খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়া, সে থাল দূরে পড়িল থালাস্থিত অন্ন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। তাহার পর সেই ভাত ও দালের হাঁড়ির অবস্থাও সেইরূপ হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন একটা প্রলয়কাণ্ড হইয়া গেল। সেই মনুষ্য-নামধারী পিশাচ তখন, আপনার পৈশাচিক কার্য্য শেষ করিয়া, উন্মত্তভাবে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

মাতা ও কন্যা একত্রে ক্রন্দন করিতে বসিল। মাতা কন্যার চক্ষের জল মুছাইয়া দিল, কন্যাও মাতার অবিরাম অশ্রু মুছাইতে লাগিল। সুখদা জননীর চক্ষের জল যতই মুছাইয়া দেয়, জননীর সেই অবিশ্রান্ত ধারা ততই বহিতে থাকে। এখন সুখদার চক্ষে কিন্তু আর জল নাই, সুখদার প্রাণ এখন জননীর জন্য আকুল হইয়াছে।

আগ্রহের সহিত সুখদা বলিল—"মা! বড় লেগেছে কি?"

নিস্তারিণী আপনার বস্ত্রাঞ্চলে এবার স্বহস্তে সে অশ্রু মুছিয়া বলিল—"না মা, আমায় লাগে-নি।"

কিন্তু কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে, পুনরায় অবিশ্রান্ত ধারা কোথা হইতে আসিয়া, তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল।

সুখদা পুনরায় বলিল—"তবে তুই আজ এত কাঁদ্‌ছিস্ কেন, মা?"

নিস্তারিণী উত্তর করিল—"আমার জন্যে কাঁদি না মা, তোর জন্যে কাঁদ্‌ছি। তুই দুধের বাছা, এত মার খেলে ক'দিন বাঁচ্‌বি?"

নিস্তারিণীর কান্না তখনও শেষ হয় নাই, আজ যেন তাহার সেই কান্না-নদীর বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুখদা তখন আর থাকিতে পারিল না, তাহার সেই ভাসাভাসা চক্ষু-দুইটি পুনঃরায় অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল। সুখদা ছলছলনেত্রে বলিল "মা, আজ তোকে বড়ই লেগেছে, ঐ যে রক্তে তোর কাপড় ভিজে গিয়েছে। মা, বাবার মার খেয়ে খেয়ে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, বাবা মার্‌লে আমায় আর লাগে না। তোকে মারতে দেখ্‌লেই আমার কেবল কান্না পায়।"

নিস্তারিণী কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"হা হতভাগিনী! এই বয়সে তোর কি কষ্ট! মা সুখদা, আমি তোর কষ্ট আর দেখ্‌তে পারিনে যে। তোকে এক দিনের জন্যও সুখী দেখ্‌লে আমি সুখে মরতে পারি। এমন অদৃষ্ট করেছি মা যে, এমন কোন আত্মীয়ও নেই, যার কাছে তোকে পাঠিয়ে দিয়ে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

সুখদা এইবার কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিল—"আমি তোকে ছেড়ে কোথাও থাক্‌তে পারবো না মা। আমি গেলে বাবা সেইদিনই তোকে মেরে ফেল্‌বে। আমায় ফেলে, তুইও কোথায় যাস্‌নে মা।"

নিস্তারিণীর মুখে আর কথা নাই! কিছুক্ষণ কেবল গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর উন্মাদিনীর ন্যায় একবার চারিদিক চাহিয়া বলিল—"হা অদেষ্ট! বাছা আমার আজ

কেবল মার খেয়ে শুয়ে থাক্‌বে! রান্না-ভাত সব নষ্ট করে গেল! ঘরে আর হাঁড়িও নেই যে, আবার দুটি চাল চড়িয়ে দেবো।"

এই কথা বলিতে বলিতে নিস্তারিণী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সুখদা জননীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"আমার ত ক্ষীদে পায়-নি মা। তুই সে জন্যে কাঁদিস্ কেন? আমি যে দিন বাবার কাছে মার খাই, সে দিন ত আর আমার ক্ষিদে থাকে না মা।"

এই সময় পুনরায় জননীর ক্ষত স্থানে সুখদার দৃষ্টি পড়িল। সুখদা তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল ও একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র আনিয়া জননীর ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে গেল। নিস্তারিণীর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই, আঘাতের কোন বেদনা এখন সে অনুভব করিতে পারিতেছিল না, এখন কেবল মনের বেদনায় নিস্তারিণী অস্থির। সুখদা ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া বলিল—"মা, পয়সা দে-না, এই বেলা তোর জন্যে কিছু খাবার কিনে আনি! বেশী রাত হলে, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।"

জননী বলিল—"পয়সা কোথায় পাব মা? আমি বড় হতভাগিনী। হা পরমেশ্বর! বাছা আমার—"

নিস্তারিণী আর কথা কহিতে পারিল না। তখন তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুখদাও আর কোন কথা কহিল না।নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

সেই পাষণ্ড নরাধম, স্বামী বা পিতার বিরুদ্ধে তাহার স্ত্রী বা কন্যা কেহই একটীও কথা বলিল না! মা ও মেয়েতে এত দুঃখের কথা হইল, তাহাদের সকল দুঃখের আকর সেই নিষ্ঠুর স্বামী ও পিতার বিপক্ষে কিন্তু একটিও কথা কাহার মুখে নাই!

সেই স্বামী-নামের অযোগ্য পশুর প্রতিও নিস্তারিণীর পতি-ভক্তি! আর ঐ ক্ষুদ্র বালিক সুখদার শিক্ষার আদর্শও তাহার সেই জননী; সুতরাং সুখদাও যে সেই নিষ্ঠুর পিতাকে ভক্তি করে, এ কথা বলাই বাহুল্য। তদ্ভিন্ন, সুখদা যে তাহার পিতাকে যমের মত ভয় করিত, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি।

নিস্তারিণী যে কথা বলিতে গিয়া বলিতে পারে নাই, এইবার সেই কথা আরম্ভ করিল—"আমি কোন্ দিক্ ভাব্‌বো? সেই যে বেরিয়ে গেছে—সে অবস্থায় কোথায় কি করছে—তাই বা কে জানে? এমন লোক নেই, যে তাঁকে ধরে বাড়ীতে নিয়ে আসে। আমাদের মারুক, কাটুক, আমরা সব সহ্য কর্‌বো; কিন্তু পরে সহ্য কর্‌বে কেন? এখন তার উপায় কি করি? কেন এমন মদ খেতে শিখেছিলো?"

সুখদা ছলছল-নেত্রে বলিল—"বাবা কেন মদ খেতে শিখেছিলো জানিস্ মা—আমাদের মার্‌বে বলে। তুই দেখিস-নে বাবা মদ খেলেই আমাদের মারে। কৈ—অন্য সময় ত মারে না মা?"

এই সময় শয়ন-গৃহের মধ্যে একটা ভয়ানক শব্দ হইল। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই পরেশনাথের শিশু পুত্রটি ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতা ও কন্যা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পুত্রের ক্রন্দনে মাতার প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে? মাতা দৌড়িয়া গৃহের মধ্যে গেল। আর মাতাকে ঐরূপভাবে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া, কন্যাও কি স্থির থাকিতে পারে? তখন মাতা ও কন্যা প্রদীপ-হস্তে সেই গৃহের মধ্যে গিয়া দেখিল

যে, পরেশনাথ নেশায় অচেতন হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া আছে। বোধ হয়, শয়ন করিবার সময় শিশু-পুত্রটির উপরেই শুইয়া পড়িয়াছিল; সেই কারণ, গুরুতর আঘাত পাইয়া, পুত্রটি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। নচেৎ পরেশনাথ, পিতা হইয়া এইরূপ শিশু-পুত্রকেও যে ইচ্ছা করিয়া প্রহার করিয়াছে, একথা আমরা মনে ধারণা করিতে পারি না। যাহা হউক সৌভাগ্য ক্রমে তাহার যে জীবন রক্ষা হইয়াছে, সেই ভাল। নিস্তারিণী দৌড়িয়া আসিয়া, পুত্র কোলে লইল। আমরা জানি, পুত্র ঐরূপ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই, জননী দৌড়িয়া গিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইতে পারিয়াছিল; নচেৎ, নিষ্ঠুর স্বামীর প্রহারে নিস্তারিণীর উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। এ পৃথিবী ছাড়া, নরক বলিয়া আবার অন্য কোন স্থান আছে নাকি?
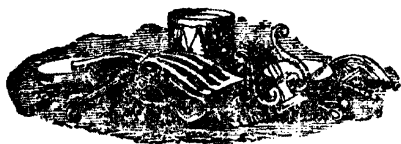
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল—পূর্ণিমার রাত্রি। সুনীল নভোমণ্ডলে পূর্ণিমার চন্দ্র পূর্ণকলা বিস্তার করিয়া হাসিতেছে। চন্দ্রের সে হাসিতে এখন পৃথিবীর চারিদিক আলোকিত। গভীর নিশির অন্ধকার, সে হাসির তোড়ে কি স্থির থাকিতে পারে? সে অন্ধকার কাজেই কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু এক কথা জিজ্ঞাসা করি—আজ চন্দ্রের এত হাসি কেন?

নিস্তারিণীর উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া চন্দ্রের জ্যোৎস্না গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এত জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছে যে সেই জ্যোৎস্নারাশিতে তাহার শয্যা যেন ডুবিয়া গিয়াছে। আর সেই জ্যোৎস্নার উপর নিস্তারিণী এখন স্বামী, পুত্র ও কন্যা লইয়া যেন ভাসিতেছে! কিন্তু নিস্তারিণী সেই সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-প্লাবিত শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সেই জন্যই কি চন্দ্রের আজ এত হাসি?

চন্দ্রমা! তোমার ও হাসি—তোমার ও জ্যোৎস্না লুকাইয়া রাখ। আজিকার দিনেও যদি তুমি হাস বা তোমার ঐ জ্যোৎস্না ছড়াও—একেত তোমার কলঙ্ক আছে, তাহার উপর এ নূতন কলঙ্ক রাখিবার স্থান আবার কোথায় পাইবে? ঐ যে অবলা

স্বামী, পুত্র ও কন্যা সহবাসেও, তোমার ঐ সুন্দর সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-রাশির মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে ; উহার প্রাণের ভিতর কি হইতেছে, তাহা কি তুমি জান ? যদি জানিতে, তোমার ঐ পাষাণ হৃদয়ও এতক্ষণ ঐ অবলার দুঃখে গলিয়া যাইত।

নিস্তারিণী আর থাকিতে পারিল না, প্রাণের জ্বালায় উঠিয়া বসিল। উঠিয়া বসিবা মাত্র, প্রথমে সুখদার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সুখদার সেই প্রফুল্ল ক্ষুদ্র মুখখানি আজ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নিস্তারিণী সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সুখদার ঐরূপ শুষ্কমুখ দেখিতে পারে না। আজ আহার অভাবে তাহার আদরের বাছার মুখ ঐরূপ শুষ্ক হইয়াছে, তখন এই কথাই হঠাৎ নিস্তারিণীর মনে উদয় হইল। সে কথা মনে হইবামাত্র, মায়ের প্রাণ যে কতদূর আকুল হইয়া উঠিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাহার পর নিস্তারিণী সতৃষ্ণনয়নে সেই বালিকার মুখখানি দেখিতে লাগিল। সেই শুষ্ক ক্ষুদ্র মুখখানি ভয়ে ক্রমে যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। কন্যার সে ভয়ের কারণও মাতা তখন বুঝিতে পারিল। একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মাতা, কন্যার সেই ক্ষুদ্র মুখ চুম্বন করিল। সেই সুদীর্ঘ নিশ্বাস ও প্রগাঢ় চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন, মাতার হৃদয়ের একটা বন্ধন তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া গেল! উন্মাদিনী মাতার দৃষ্টি তখন অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। সে দৃষ্টি কি দেখিল ? দেখিল—তাহার সেই নিদ্রিত শিশুপুত্র, অধিকক্ষণ ক্রন্দনের পর তখনও মধ্যে মধ্যে ফোঁপাইতেছে। সেই ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণে এত ভয় কোথা হইতে আসিল ? ভয়ে সে শিশুও যেন মধ্যে মধ্যে চম্‌কাইয়া উঠিতেছিল! মাতা এবারেও একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া

সেই শিশুপুত্রের মুখচুম্বন করিল। এবারেও ঐ দীর্ঘনিশ্বাস ও চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে মাতার হৃদয়ের আর একটা বন্ধন ছিঁড়িল। মাতা আর সে দিকে চাহিল না, এবার অন্যদিকে চাহিল। সে দিকে কি দেখিল? দেখিল—তাহার ইহকালের সাক্ষাৎ দেবতা ও পরকালের মুক্তিদাতা স্বামী, তখনও নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন! নিস্তারিণী ধীরে ধীরে উঠিয়া, সেই পাষণ্ড স্বামীর চরণ ধরিয়া বলিল—"প্রভু! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আমি আজ যে কাজ করতে উদ্যত হয়েছি, তাতে তুমি না ক্ষমা কর্‌লে, আমার আর অন্য উপায় নেই। তোমার সেবা করলে, আমার ধর্ম্ম হইত, আমি জানি; কিন্তু আমি অভাগিনী—আমার অদৃষ্টে সে সুখ ঘট্‌বে কেন? আমায় ক্ষমা কর—আমায় ক্ষমা কর।"

নিস্তারিণী আর কথা কহিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া নিস্তারিণী স্বামীর চরণে প্রণাম করিল।

একি! নিস্তারিণী এ কি করিতেছে? উন্মাদিনী কড়ি-কাঠে রজ্জু টাঙ্গাইতেছে কেন? তবে কি মনোদুঃখে সতী আত্মঘাতিনী হইবে নাকি? যাহার কল্পনায় শরীর রোমাঞ্চিত হয়, যে কথা মনে ধারণা করিতেও পারা যায় না, তাহাই কি আমাদের স্বচক্ষে দেখিতে হইবে!

নিস্তারিণী ফের—ফের! একবার ফিরিয়া চাও! তোমার ঐ পাষণ্ড স্বামীর প্রতি না চাও—একবার ঐ স্নেহের পুত্তলি শিশুর মুখপানেও চাও! আর যাহার শুষ্কমুখ দেখিলে তুমি পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে, তোমার সেই সুখদার মুখপানে একবার

চাও! জীবন্মৃত নিস্তারিণী এত বল কোথায় পাইল, আমরা জানি না, কিন্তু নিস্তারিণী স্বহস্তে আপনার মৃত্যুরজ্জু যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সক্ষম হইল। নিস্তারিণী আমাদের কথা শুনিল না! নিস্তারিণী কাহারও পানে চাহিল না!

কি কর নিস্তারিণী—কর কি! কিন্তু সেই জ্যোৎস্নালোকে স্বামী, পুত্র ও কন্যার মুখ দেখিতে দেখিতে মরণের লোভ নিস্তারিণী সম্বরণ করিতে পারিল না। আমাদের হৃদয়ও বড় কঠিন; সেই কারণই এই লোমহর্ষণ দৃশ্যের এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। কিন্তু আমরাও ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কুক্ষণে আমরা এই পরিচ্ছেদ লিখিতে বসিয়াছিলাম!

দেখিতে দেখিতে,সতীর সেই দুঃখময় জীবনের শেষ যবনিকার পতন হইয়া গেল! সংসার আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ভূতলে খসিয়া পড়িল!

চন্দ্রমার সে সুধাময় জ্যোৎস্না আর নাই! এই সময় কোথা হইতে একখণ্ড মেঘ আসিয়া, পূর্ণিমার সেই পূর্ণচন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে তখন ঘোর ঘটায় চারিদিক অন্ধকারে আবৃত হইল। মেঘগর্জ্জন ও বজ্রনাদে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি দেখা দিল। ইহা কি প্রকৃতির আকস্মিক পরিবর্ত্তন—না প্রলয়?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে একটা কুস্বপ্ন দেখিয়া সুখদা চীৎকার করিয়া উঠিল—"মা!"

কিন্তু কই?—সুখদার পার্শ্বে ত তাহার মা নাই! সুখদা কি ঘুমের ঘোরে মাকে দেখিতে পাইতেছে না? কিন্তু সুখদা যখন তাহার বাপকে আর ভাইকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, তখন তাহার মাকে দেখিতে পাইবে না কেন? ওগো—এই-মাত্র সেই কুস্বপ্নটা দেখিয়া, সুখদার প্রাণ যে তাহার মার জন্য বড় অস্থির। তাইত কি হইবে—এখন সুখদার মা কোথায় গেল?

বিস্মিতা বালিকা বিস্ময়নেত্রে গৃহের চারিদিক তখন একবার চাহিল। হরি হরি! এ কি! এ কি ভীষণ দৃশ্য! বালিকা জাগ্রৎ না নিদ্রিত? এখনও কি বালিকা স্বপ্ন দেখিতেছে, না যথার্থই তাহার জননী ঐ বিভীষিকামূর্ত্তিতে সম্মুখে ঝুলিতেছে! সুখদা কিছুইত স্থির করিতে পারিল না। তাহার স্নেহময়ী জননীর ঐ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সুখদা তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুখদার জননী মৃত না জীবিত? সুখদা তখন ইহাই স্থির করিবার

জন্য কম্পিতহৃদয়ে উৰ্দ্ধনেত্রে জননীর মুখের প্রতি চাহিল। তখনও সুখদার জননীর বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় হইতে যেন স্নেহের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সে উৰ্দ্ধদৃষ্টিও যেন নিম্নে সুখদার মুখের উপর স্থাপিত হইল। কিন্তু সেই লোলজিহ্বাই সুখদার আতঙ্কের কারণ। সুখদার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সুখদা পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল। এবার সেই ভীষণ চীৎকারে, নিদ্রা ও নেশার ঘোরে অচেতন পরেশনাথেরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল; আর সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া তাহার নেশার ঘোরও তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ছিল। পরেশনাথ বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে নিস্তারিণীর প্রতি চাহিল। তৎক্ষণাৎ, কি মনে করিয়া, অস্ত্র দ্বারা দড়ি কাটিয়া সে নিস্তারিণীকে নামাইল। কিন্তু যে আশায় পরেশনাথ নামাইল সে আশা বহুপূৰ্ব্বেই নির্ম্মূল হইয়াছিল। নিস্তারিণীর অবস্থা বুঝিয়া পরেশনাথ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আর সুখদার চীৎকারে এদিকে গগন ফাটিতেছিল। কেবল গগন ফাটিতেছিল না, সেই সঙ্গে সুখদার সেই ক্ষুদ্র বুকখানিও বুঝি ফাটিয়া যায়! সুখদার জননী যে, তাহাকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারে, এ কথা সুখদা মনে ধারণা করিতেও পারে না। আচ্ছা, সুখদাকে কাহার কাছে রাখিয়া তাহার জননী চলিয়া গেল? তাহার পিতার কাছে? সুখদা জননীকে ছাড়িয়া সেই নিষ্ঠুর পিতার কাছে একাকী কিরূপে থাকিবে? সুখদার আর এ পৃথিবীতে কে কাছে? সুখদার ঐ ছোট ভাইটীকেই বা কে মানুষ করিবে? যদি একান্তই নিস্তারিণীর এ পাপ সংসার ত্যাগ করা আবশ্যক হইয়াছিল, তবে তাহাদেরও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়াও কি

তাহার উচিত ছিল না? সুখদার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে তখন এইরূপ প্রবল ঝড় বহিতেছিল।

আর পরেশনাথ? ভয়ে ও বিস্ময়ে পরেশনাথের প্রাণ এখন আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যে নরাধম আপনার বুদ্ধিকৌশলের গৌরব করিয়া বেড়াইত, এখন তাহার সে বুদ্ধিও লোপ পাইয়াছে। পরেশনাথ যত বড় পাষণ্ড হউক না কেন, এখন সে তাহার নিজের কীর্ত্তি দেখিয়া নিজেই স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। দেখ্—নরাধম্ দেখ্! তোর ষড়যন্ত্রের পৈশাচিক ক্রিয়ার পরিণাম দেখ্! পাপীর মন ভয়ের বিশাল-রাজ্য। পরেশনাথ এই ঘটনায় এখন ভয়েই অস্থির হইয়াছিল। নিস্তারিণীর মৃত্যুতে পরেশনাথ এখন ততদূর অস্থির নহে; এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য সে ততদূর অস্থির। এরূপ স্থলে পুলিশে সংবাদ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, পরেশনাথ আর কাল বিলম্ব করিল না, তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ দিল।

তখন পুলিসের তদারকের একটা ধূম পড়িয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালায় পরেশনাথের বাড়ী পরিপূর্ণ হইল। পাড়ার নিরীহ ভদ্রলোকেরা ভয়ে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু এদিকে পরেশনাথের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইল; সেই লোকারণ্যের মধ্যে পাড়ার লোকও অনেক ছিল। তাহারা পরস্পরে নানাকথা কহিতে লাগিল। রাত্রি দশটার পর পরেশনাথের বাড়ীর ভিতর হইতে যে ভয়ানক ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল—একথাও তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল। ফল কথা—পরেশনাথের স্ত্রী যে

আত্মঘাতী হয় নাই, পরেশনাথ নিজেই যে তাহাকে হত্যা করিয়া এখন এইরূপ রটাইতেছে, এ বিশ্বাস অনেকেরই মনে ধারণা হইয়া গিয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, এইরূপ একটা সংবাদ পাইলেন। তখন মহাদম্ভে মস্‌মস্ শব্দে চারিদিক কম্পিত করিতে করিতে,দ্রুতপদে তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই লাসের পরীক্ষা করা হইল। নিস্তারিণীর মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন ও তাহার পরিধেয় বস্ত্রে রক্তের দাগ দেখিয়া ইনস্পেক্টর সাহেবের আর আহ্লাদের সীমা নাই—তিনি যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ জমাদার সাহেবের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"জমাদার সাহেব, এ খুনী মামলা মালুম হোতা, আসামীকে পাকাড়কে রাখো।"

"যো হুকুম খোদাবন্দ—" বলিয়া খাঁ সাহেব পরেশনাথকে দুইজন পাহারাওয়ালার জিম্মায় রাখিয়া দিল। ভয়ে তখন পরেশনাথের প্রাণ উড়িয়া গেল। সাহেবের Medical Jurisprudence পড়া ছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু নিস্তারিণীর সেই মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া, কথিত অপঘাত-মৃত্যুর কোন চিহ্নই সাহেব দেখিতে পাইলেন না। তখন জমাদার খাঁ সাহেবকে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোম্‌কো ক্যা মালুম্ হোতা খাঁ সাহেব?"

খাঁ সাহেব আজ বিশ বৎসর কলিকাতা পুলিসে কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার অজানিত কিছুই ছিল না, বিশেষতঃ তিনি এ বয়সে অনেক অপঘাতকে খুন, আর খুনকে অপঘাত করিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধিমানের ন্যায় ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের

কথার পোষকতা করিয়া বলিলেন—"এ আউরৎ আলবৎ খুন হুয়া।"

সাহেবের আর আহ্লাদের সীমা নাই। অনেক দিনের পর আজ তিনি একটা খুনী মামলা পাইয়াছেন। তখন এই খুনের সহিত পরেশনাথকে গাঁথিয়া দিতে পারিলেই তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হয়। এই কার্য্যটা কিরূপে করিবেন, তাহার জন্য একটু স্থির হইয়া চিন্তা করার আবশ্যক; এদিকে বাহিরের লোকের কোলাহলে সাহেব মাথা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এত গোলের মধ্যে তিনি মামলা সাজাইবেন কিরূপে? সুতরাং সাহেব বিরক্ত হইয়া একজন পাহারাওয়ালাকে হুকুম দিলেন—"বাহারকা আদ্‌মী সব হাঁকায় দেও।"

তখন পাহারাওয়ালা রুল হস্তে দৌড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিল। সেই একজন মাত্র পাহারাওয়ালা দেখিয়া, বাহিরের অসংখ্য জনস্রোত যে যে দিকে পাইল, সে সেই দিকেই ছুটিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই রাস্তা জনমানবশূন্য হইয়া গেল। পাহারাওয়ালা তখন আপনার কার্য্যোদ্ধার করিয়া মহোল্লাসে পুনরায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আর সেই লজ্জাহীন বীরপুরুষগণ অমনি ক্রমে এক একজন করিয়া পুনরায় সেই স্থানে একত্রিত হইতে লাগিল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব প্রথমেই সেই দশম বৎসরের বালিকা সুখদাকে লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। সে হতভাগিনী বালিকার বিপদের উপর আবার বিপদ দেখ! সাহেব প্রথমেই তাহাকে প্রশ্ন করিল—"তোমার মাকে কে খুন করিয়াছে, তুমি জান?"

সেই পুলিশের লোকজন দেখিয়াই সুখদার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং সুখদা নীরবে রহিল। সুখদাকে নীরব দেখিয়া সাহেব একটা ভীষণ ধমক্ দিলেন। সে ধমকে সুখদা কাঁদিয়া ফেলিল। জমাদার একজন বিচক্ষণ লোক; সে তখন সুখদাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অনেক প্রকার সান্ত্বনা করিল এবং সমস্ত কথা সত্য বলিলে কোন ভয় নাই, এই কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় সাহেবের নিকট আনিল। এই সময় সাহেবকেও কানে কানে কি কথা বলা হইল। সাহেব তখন প্রশ্ন করিলেন—"কাল রাত্রে তোমার বাপের সহিত তোমার মায়ের কোন বিবাদ হইয়াছিল?"

সুখদা উত্তর করিল—"হাঁ।"

সাহেব তাড়াতাড়ি সেই কথা লিখিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু খাঁ সাহেব ইঙ্গিতের দ্বারা সাহেবকে সে কথা লিখিতে নিষেধ করিলেন। সাহেব অল্পদিন মাত্র পুলিশবিভাগে কার্য্য করিতেছেন। এ সকল বিষয়ে সাহেবের অভিজ্ঞতা অতি অল্পই ছিল কিরূপে মোকর্দ্দমা সাজাইতে হয়, সাহেবের এখনও সে শিক্ষা হয় নাই। খাঁ সাহেব এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, সাহেবকে নীরব দেখিয়া এইবার নিজেই সুখদাকে প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন—"কাল রাত্রে তোমাদের বাড়ীতে কে কে ছিল?"

সুখদা।—আমি, বাবা, মা আর আমার ছোট ভাইটী।

খাঁ-সাহেব।—রাত্রি দশটার সময় তোমরা চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলে কেন?

সুখদা।—বাবা মেরেছিলেন বলে

খাঁ-সাহেব।—কাকে মেরেছিল?

সুখদা।—মাকে আর আমাকে।

খাঁ-সাহেব।—কেন মেরেছিল?

সুখদা। রাঁধ্‌তে দেরী হয়েছিল বলে।

খাঁ সাহেব।—প্রথমে কাকে মেরেছিল?

সুখদা।—মাকে।

খাঁ-সাহেব।—কি দিয়ে মেরেছিল?

সুখদা।—হাত দিয়ে।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আর থাকিতে পারিলেন না। সুখদার এজাহারে আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিতেছিল। তিনি এই সময় হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন,—"সেই আঘাতেই তোমার মার মৃত্যু হইয়াছে কি না?"

সাহেবের প্রশ্ন শুনিয়া খাঁ-সাহেব মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু উপরওয়ালার উপর তিনি আর কি কথা কহিবেন? কাজেই চুপ করিয়া রহিলেন। সুখদা সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"সে আঘাতে মার মৃত্যু হবে কেন? মা সেই জন্য রাগ করে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন।"

বালিকার উত্তর শুনিয়া সাহেব তখন খাঁ সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনির অর্থ এই—"আমি আর কোন প্রশ্ন করিব না, তুমি যেন তেন প্রকারেণ এ মোকর্দ্দমার একটা উপায় কর।"

খাঁ-সাহেব তখন কিছু গম্ভীর হইয়া গোঁপে চাড়া দিতে দিতে পুনরায় প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন—"তুমি সে কথা কি করে জান্‌লে?"

সুখদা।—সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে দেখি, মা আমার কাছে নেই। তার পর চারদিকে চেয়ে, দেখ্‌তে পেলুম—ঐ কড়িকাঠে দড়ি গলায় বেঁধে মা ঝুল্‌ছে।

খাঁ সাহেব।—তখন তোমার বাবা কোথায় ছিল?

সুখদা।—বাবা এই ঘরেতেই তখনও ঘুমুচ্ছিল।

খাঁ সাহেব।—তুমি ঐ রকম অবস্থায় তোমার মাকে দেখে কি করলে?

সুখদা।—আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম।

খাঁ সাহেব।—আর তোমার বাবা সে সময় নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগ্‌লেন?

সুখদা।—আমার চীৎকারে আমার বাবার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

খাঁ সাহেব।—ঘুম ভেঙ্গে গেলে তোমার বাপ কি করলে?

সুখদা।—তাড়াতাড়ি উঠে গলার দড়ি কেটে দিয়েছিলেন।

খাঁ সাহেব।—ঘুম ভেঙ্গে উঠেই অমনি দড়ি কেটে দিল, আর একটি কথাও বল্‌লে না?

সুখদা এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে বালিকা—এরূপ অবস্থায় সে যে এতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। এরূপ অবস্থাপন্ন বালিকার নিকট ইহার অধিক আমরা আর কি আশা করিতে পারি? সুখদাকে নিরুত্তর দেখিয়া, খাঁ সাহেব আস্ফালন করিয়া সাহেবকে বলিলেন—"এ লেড়্‌কীকা সাম্‌নে খুন হুয়া নেহি। লেকেন্ এ হারামজাদ জরুকো যে খুন কিয়া—এ লেড়্‌কীকো এজাহার মে হামারা এ মালুম হোতা।"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের আর আহ্লাদের সীমা নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ লাস শুদ্ধ আসামীকে চালান দিতে প্রস্তুত। জমাদার খাঁ সাহেব কিন্তু এই সময় পাড়ার তিন চারি জন সাক্ষী লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই গতরাত্রে পরেশনাথের সুরা-পান এবং অত্যাচারের কথা বলিল। আর রাত্রি দশটার পর একটা ভয়ানক আর্ত্তনাদ যে তাহার বাড়ীর মধ্য হইতে উঠিয়াছিল, সে কথাও এজাহারে প্রকাশ করিল। তখন পরেশ-নাথকেই খুনের আসামী করিয়া লাস-সমেত চালান দেওয়া হইল। পরেশনাথ এই ঘটনায় হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যাইবার সময় সে একজন লোকের দ্বারা হীরালাল বাবুকে এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ দিতে ভুলিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল বাবু আফিস যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একজন লোক আসিয়া পরেশনাথের এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ তাঁহাকে দিল। হীরালাল সে সংবাদে প্রথমে অনেকক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন; তাহার পর আর আফিসে না গিয়া পরেশনাথের বাসার দিকে ছুটিলেন। লোকের বিপদের কথা শুনিলে হীরালালের প্রাণ স্বভাবতই আকুল হইয়া উঠে। বিপদের সময় কেহ তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে, নিজের কাজকর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা—হীরালালের স্বভাবসিদ্ধ। নিজের সহস্র কর্ম্ম ক্ষতি করিয়া যদি পরের তিলমাত্র উপকার হয়, হীরালাল তাহার জন্যও সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। পরোপকার ধর্ম্ম বটে, কিন্তু হীরালালের চরিত্রে সে পরোপকারের যেরূপ আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক সময় তাহাকে ধর্ম্ম বলিতেও আমাদের কুণ্ঠিত হইতে হয়।

হীরালাল পরেশনাথের বাসায় আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার শিশুপুত্র আর বালিকাকন্যা ভিন্ন সে বাসায় এখন আর কেহ

নাই। সেই ছোট ভাইটীকে ক্রোড়ে লইয়া সুখদা তখন চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছিল; হীরালালকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক সান্ত্বনার পর, সুখদা একটু সুস্থির হইল। তাহার পর তাহারই মুখে হীরালাল গত রা ্রর ও অদ্যকার প্রাতের সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। সুখদার চক্ষের জল স্বহস্তে মুছাইয়া দিয়া হীরালাল বলিলেন—"তুমি কেঁদ না মা—যা বিপদ হবার তা হয়ে গেছে; এখন তার আর কোন উপায় নেই। তবে তোমার বাপের জন্য কোন ভয় নেই; আমি এখনই গিয়ে তাঁকে খালাস করে আনছি। তবে একলা এরূপ অবস্থায় তোমায় এ বাড়ীতে রেখে কি করে যাবো? আগে তোমায় আমাদের বাড়ী রেখে আসি চল, তার পর তোমার বাবাকে এনে দেবো।"

এরূপ বিপদের সময় কেহ কোনরূপ সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক, সুখদার নিকটে জনপ্রাণীও ছিল না। সুখদার জীবনের একমাত্র অবলম্বন তাহার মাতাকে সে আজ অকস্মাৎ জন্মের মত হারাইয়াছে। তার পর ভাল হউক—মন্দ হউক, এরূপ বিপদে একমাত্র ভরসাস্থল তাহার পিতাকেও খুনী আসামী করিয়া পুলিস ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার এই ক্ষুদ্র ভাইটীরই বা কি উপায় হইবে? ইহারই মধ্যে সে শিশু ক্ষুধায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত রাত্রি হইতে সুখদারও আহার হয় নাই; কিন্তু সুখদার মনে সে কথা এখন স্থান পায় নাই। সে বলিকার নিকট একটী পয়সাও ছিল না, থাকিলেই বা কাহার নিকট সেই শিশুটী রাখিয়া সুখদা তাহার দুগ্ধের চেষ্টায় যাইবে? এই ক্ষুদ্র

বালিকা যেদিকে চায়, সেইদিকই অন্ধকার। দশ বৎসরের বালিকা হইলেও সুখদার সেই ক্ষুদ্রহৃদয় সেই সময় এই সকল ভীষণ চিন্তা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল। কিন্তু সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বর কি অনাথা বালিকার উপায় করিবেন না? ঐ দেখ, অল্পক্ষণ পরেই সেই অকুলের কাণ্ডারী হরি হীরালালরূপে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন!

হীরালালের উপরোক্ত সস্নেহ-সম্ভাষণে সুখদা যেন অকূল সাগরের কূল পাইল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কাকা বাবু, আমার মাকে কি আর দেখ্‌তে পাবো না?"

যেরূপ কাতরকণ্ঠে ঐ কথা কয়েকটী উচ্চারিত হইল, তাহাতে হীরালালের প্রাণ একেবারে আকুল হইয়া উঠিল। যে চক্ষের জল হীরালাল এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, এইবার সে চক্ষের জল আর তিনি ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। হীরালাল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"তুমি কেঁদ না মা। আগে তোমায় আমার বাড়ীতে রেখে আসি, তার পর, যা যা কর্ত্তে হয়, তা আমি কর্‌বো। এখানে আর দেরী করা হবে না। দেরী কর্‌লে অনিষ্ট হতে পারে।"

পরমুহূর্ত্তেই চক্ষের জল মুছিয়া সেই ছোট ভাইটিকে বুকে তুলিয়া সুখদা দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং হীরালালের সঙ্গে তাঁহার বাড়ী যাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইতে লাগিল। হীরালাল তখন পরেশনাথের বাড়ী চাবিবন্ধ করিয়া সেই বালিকাকে সঙ্গে লইয়া নিজ বাড়ীতে চলিলেন। সম্মুখে একখানি ভাড়াটে গাড়ী দেখিয়া, হীরালাল সেই গাড়ী ভাড়া করিলেন, এবং তাহাতে সুখদাকে উঠিতে বলিলেন। সুখদা সেই গাড়ীতে

উঠিল। কিছুদূর গাড়ী যাইতে না যাইতেই সেই ক্রোড়স্থিত শিশু কিন্তু নিদ্রিত হইয়া পড়িল!

দুই চারি কথায় সমস্ত পরিচয় দিয়া, হীরালাল অমলার নিকট সুখদা আর তাহার ভ্রাতাকে রাখিয়া দিলেন এবং পরেশনাথের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন। অমলা ভিন্ন তখন আর কাহাকেও হীরালাল কোন কথা বলিলেন না। ভ্রাতা ভগিনীকে চিনিত, আর ভগিনীও ভ্রাতাকে জানিত; সুতরাং সে সময় অমলাও আর অধিক কথা কহিয়া ভ্রাতার সময় নষ্ট করিল না।

পুলিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত হীরালালের পরিচয় ছিল। হীরালাল প্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন; তিনি তাঁহার একজন নিম্নস্থ কর্ম্মচারীকে কি উপদেশ দিয়া, হীরালালকে তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। হীরালাল প্রথমে যে থানা হইতে তদারক হইয়াছিল, সেই থানায় আসিলেন। সেখানে যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল, সমস্ত জানিয়া কমিশনার সাহেবের আফিসে আসিলেন। সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শবপরীক্ষার ফল জানিবার জন্য তাঁহাকে অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষার ফল যে কি হইল, অনেক চেষ্টা করিয়াও তখন তাহা জানিতে পারা গেল না। সে দিন রাত্রি দশটার পর হীরালাল বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হীরালালের মুখে সুখদার পরিচয় ও তাহাদের আকস্মিক বিপদের সংবাদ পাইয়া অমলার হৃদয় সুখদার জন্য আকুল হইয়াছিল; তাহার পর সুখদার ঐ শুষ্কমুখ দেখিয়া, পরদুঃখ-কাতরা অমলার হৃদয় যেন সহানুভূতিতে গলিয়া গেল। সে হৃদয় এত কোমল যে, পরদুঃখ-বহ্নির লেশও সহ্য করিতে পারে না; অথচ আবার এত দৃঢ় যে, নিজের অসহনীয় দুঃখেও সে হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। কখন কোমল—কখন দৃঢ় সে হৃদয় আমরা এক প্রকার বুঝাইতে পারি, কিন্তু সে ক্ষুদ্র হৃদয় এরূপ বিশাল তেজস্বিনী বুদ্ধির আধার কিরূপে হইল, তাহা বুঝাইতে পারি না। অমলা বাল-বিধবা, সুতরাং তাহার মতন দুঃখিনী এ পৃথিবীতে আর কে আছে? কিন্তু নিজের দুঃখের কথা অমলার মনে কখন উদয় হইত না। অমলা যেন বাল-বিধবা হইয়াই, মাতৃগর্ভ হইতে এই দুঃখময় সংসারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতে অমলার আবার দুঃখ কি? কিন্তু কাহার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে অমলার দুঃখের আর সীমা থাকিত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক—অমলা ইতর-প্রাণীর দুঃখও স্বচক্ষে দেখিতে পারিত না। পশু, পক্ষী,

কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর জন্যও অমলার প্রাণ কাঁদিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অমলা নিজের অসহনীয় দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করিত না, অথচ পরের দুঃখের কথা শুনিলেই কাঁদিয়া আকুল হইত। কাঁদিয়া আকুল হইত বটে, কিন্তু সে কান্নাও অনেক সময় কেহ দেখিতে পাইত না। অমলা নীরবে অন্তরে কাঁদিত, অথচ সে সময় অমলার বুদ্ধি স্থির থাকিত। তাহার যতদূর ক্ষমতা প্রাণপণে সে দুঃখ মোচনের চেষ্টাও করিত। পরদুঃখমোচনে অমলা আত্মহারা হইত বটে, কিন্তু কখন দিশেহারা হইত না। কি উপায় অবলম্বন করিলে, সে দুঃখ মোচন হইতে পারে, সে সময় অমলার তেজস্বিনী বুদ্ধি তাহা জানিত।

আমরা পূর্ব্বেই পরিচয় দিয়াছি, অমলা বাল-বিধবা। দশ বৎসর বয়সের সময় অমলা বিধবা হয়, সুতরাং স্বামীর সহিত কোনরূপ ভালবাসা জন্মাইবার পূর্ব্বেই তাহার কপাল পুড়িয়া যায়। সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় সে স্বামীর স্মৃতিও তাহার হৃদয় মধ্যে নিহিত ছিল। কিসে কি হইল জানি না, অমলার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় অসীম স্বর্গীয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই আধারশূন্য ভালবাসা সে ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তখন অমলার আর আত্মীয়পর জ্ঞান রহিল না, বর্ষাকালের নদী যেমন কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে তটস্থ জমী প্লাবিত করে, সেইরূপ অমলার ক্ষুদ্রহৃদয়প্লাবিত ভালবাসা আত্মীয়পর জ্ঞানশূন্য হইয়া, নিকটস্থ সকলকেই বিমোহিত করিত।

অমলা সুখদাকে প্রথমে আহার করাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু সুখদা বলিল—"আমার খেতে ইচ্ছে নেই;

তোমাদের ঘরে যদি দুধ থাকে, তবে আমার ভাইকে একটু দাও।"

অমলা তাড়াতাড়ি দুগ্ধ আনিয়া তখন সেই শিশুকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। দুগ্ধ খাওয়ান শেষ হইলে পর, অমলার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল; অমলা তৎক্ষণাৎ একবাটী তৈল আনিল। প্রথমে শিশুটীকে মাখাইল, তাহার পর সুখদাকে মাখাইতে বসিল। তেল-মাখান শেষ হইলে, অমলা দুইজনকে স্নান করাইয়া দিল। সুখদা এক বস্ত্রে আসিয়াছিল, অমলা তাহাকে একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দিল। এই সময় সেই ঝি এক ঠোঙ্গা খাবার আনিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই মুখরা ঝি, সুখদা আর তাহার সেই শিশু ভ্রাতাকে দেখিয়া, অনেকক্ষণ বিস্মিত-নেত্রে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! অমলা যখন তাড়াতাড়ি ঝিকে জলখাবার কিনিতে পাঠাইয়া দিল, তখন ঝি মনে করিয়াছিল যে, নিশ্চয় কোন কুটুম্ব বা কুটুম্বিনী আসিয়াছে, কিন্তু জলখাবার আনিয়া সুখদা আর তাহার ভ্রাতাকে দেখিয়া ঝি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল! ঠোঙ্গাটি অমলার হাতে দিয়া ঝি জিজ্ঞাসা করিল—"এরা কে গা?"

অমলা উত্তর করিল—"পরেশ বাবুর মেয়ে আর ছেলে।"

ঝি।—পরেশ বাবুর! কোন্ পরেশ বাবু?

অমলা।—দাদার বন্ধু—পরেশ বাবু।

ঝি।—তাই ভাল। তোমায় ব্যস্ত দেখে আমি মনে করে ছিলুম, বুঝি তোমার শ্বশুর-ঘর থেকে কোন কুটুম্ব এসেছে।

অমলা ঝির সে কথায় কান না দিয়া, তখন সুখদাকে সেই খাবার খাইতে অনুরোধ করিল। এতক্ষণ সুখদা অমলার মিষ্ট

কথায় সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অমলা যখন খাওয়াবার জন্য তাহাকে যত্ন করিতে লাগিল, তখন হঠাৎ জননীর কথা সুখদার মনে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে অকস্মাৎ একটা বিশাল শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সুখদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, আমার মা না খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেছে। আমার আর খাবার ইচ্ছে নেই।"

অমলা সুখদাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"স্নান করে অমনি থাকতে নেই মা। অমনি থাক্‌লে ঐ ভায়াটির অকল্যাণ হবে যে। যা হবার—হয়ে গেছে মা, এখন ঐ ছোট ভাইটির কল্যাণ ত চাই।"

সুখদা আর দ্বিরুক্তি করিল না, তৎক্ষণাৎ চক্ষের জল মুছিয়া সেই খাবারের কিয়দংশ খাইল। এইবার সেই ঝি আরম্ভ করিল,—"ওমা! গলায় দড়ি দিয়ে যার মা মরে গেছে, এখন কি তাকে পরের বাকুলকে এস্‌তে আছে? দিদি বাবু, তোমার আক্কেলখানা কি? তুমি ওর ভেয়ের কল্যেণ খুঁজছ, আর নিজের ভায়ের অকল্যেণ কর্‌ছো যে! ওর মা আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, আর তুমি ওকে বাড়ীর ভেতর আস্‌তে দিলে? তোমার কি ধর্ম্মকর্ম্ম জ্ঞান নেই? তুমি কি বলে ওকে ছুঁলে?"

ঝির কথা শুনিয়া, সুখদা তখন ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া অমলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। অমলাও সে চাহনির অর্থ বুঝিল। তৎক্ষণাৎ ঝিকে ইঙ্গিতের দ্বারা এইরূপ কথা বলিতে নিষেধ করিয়া বলিল—"তুই বাছা, একটু চুপ কর্। পরের ভাল কর্‌লে, নিজের কখন মন্দ হয় না। আমি স্নান করবো এখন; তুই বাছা, মাকে যেন কোন কথা বলিস নে।"

ঝিকে একবার এককথা বলিতে নিষেধ করায়, সে সেই নিষেধ-আজ্ঞা যেরূপ পালন করিয়াছিল, এবারও সেইরূপ পালন করিল। একটা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে ঝি পূর্ব্বের ন্যায় এবারও অজ্ঞাতসারে আর একটা অগ্নি জ্বালাইয়া দিল।

তখন অন্যত্রে ঝির কাজ ছিল, কিন্তু কি জানি কেন তাহার পদদ্বয় তাহাকে অন্যত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতে কোন ক্রমেই সম্মত হইল না। তাহার পদদ্বয় এখন তাহাকে গৃহিণীর সন্নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক চেষ্টার পর তাহার সে পদদ্বয় একবার কিছুদূর অন্যদিকে গেল বটে, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই আবার গৃহিণীর দিকেই ফিরিল। ধীরে—ধীরে—ধীরে ঝি গৃহিণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার রসনার গৃহিণীর সহিত অন্য অনেক কথা ছিল বটে, কিন্তু পদদ্বয়ের ন্যায় তাহার রসনাও আজ আর তাহার বাধ্য নয়। তখন ঝি একটু ইতস্ততঃ করিয়া গৃহিণীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। এতক্ষণের পর এইবার ঝির ধড়ে প্রাণ আসিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সাবিত্রী যখন ঝির মুখে পরেশনাথের স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যুর কথা শুনিলেন, তখন এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া পরেশনাথের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সেই অপঘাত মৃত্যুর পর, পরেশনাথের পুত্রকন্যা তাঁহারই বাড়ীতে আসিয়াছে, এবং তাঁহারই কন্যা অমলা তাহাদিগকে স্নানাদি করাইয়াছে, এই কথা আবার যখন শুনিলেন, তখন তাঁহার সেই সহানুভূতি ক্রোধে পরিণত হইল। সে ক্রোধের পূর্ণ মাত্রা তখন অমলারই উপর পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি অমলার নিকট আসিলেন। অমলা তখন ঘরের মেজে শয্যা প্রস্তুত করিয়া সুখদার ছোট ভাইটীকে ঘুম পাড়াইতেছিল। সাবিত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কন্যার সম্মুখে আসিয়া সে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সেই অপগণ্ড শিশু আর মাতৃহীন বালিকার মুখ দেখিয়া, গৃহিণীর ক্রোধ কোথায় চলিয়া গেল। তিনি ঝির ন্যায়, তাহাদের সম্মুখে কোন কথা না বলিয়া কন্যাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এরা কে?"

অমলা তাহার ভ্রাতার মুখে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিল,

অকপটচিত্তে জননীর নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। সাবিত্রী আপনার পুত্রের মুখে পরেশনাথের নাম মাত্র শুনিয়াছিলেন, তাহার অন্য পরিচয় কিছুই জানিতেন না; সুতরাং তাহার বিপক্ষে কোন কথা না বলিয়া কেবল মাত্র বলিলেন—"এদের এখানে আন্‌লে কে?"

অমলা।—দাদা এনেছেন।

সাবিত্রী।—হীরালাল আফিস যায়-নি?

অমলা।—এক জন বন্ধুলোকের এরূপ বিপদের কথা শুনে কি করে আফিস্ যাবেন?

সাবিত্রী।—আফিসে না গেলে, তার চাক্‌রী থাক্‌বে কেন? এখন সে গিয়েছে কোথায়?

অমলা।—পুলিসের লোকে পরেশ বাবুকে কি বিপদে ফেলেছে, তাই এদের এখানে রেখে পুলিসেই গিয়েছেন।

অমলার এই কথায় গৃহিণীর ক্রোধের চিহ্ন পুনরায় দেখা দিল। পুত্র আফিসে না গিয়া পরের জন্য থানা-পুলিস করিয়া বেড়াইতেছে, আর তাঁহার কন্যা গৃহে বসিয়া গৃহস্থের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, এক শূদ্রবংশীয়া আত্মঘাতিনীর পুত্রকন্যাকে আবার স্নানাদি করাইয়াছে গৃহিণীর প্রাণে তাহা সহ্য হইবে কেন? সুতরাং গৃহিণী রাগিয়া কন্যাকে বলিলেন—"যেমন ভাই, তেমি বোন— আমার অদৃষ্টে দুই সমান হয়েছে। তোরা কেউ আমাকে সুখী করবিনে। আজ ওদের বাড়ীতে মড়া মরেছে, আর আমার বাড়ী এসে ওরা নাইলে! এবুদ্ধি তোদের নেই? আমি তোদের জ্বালায় যে জ্বালাতন হলেম।"

এ সময় কোন কথা বলিয়া জননীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, জননীর ক্রোধ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইবার সম্ভব। সেই কারণ, অমলা এ সময় কোন কথা বলিল না, নীরবে জননীর তিরস্কার সহ্য করিতে লাগিল। সাবিত্রীর ক্রোধের একটু উপশম হইলে বলিলেন—"এখন যাও, ফের নাওগে যাও, না নেয়ে কিন্তু পর-সংসারের কোন জিনিষপত্র ছুঁতে পাবে না।"

অমলা ধীরে ধীরে স্নান করিতে যাইতেছিল, এমন সময় জননী পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন—"ভাত খেয়ে নাইলে যদি তোর অসুখ করে। না হয় একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করে থাক্‌গে যা।"

অমলা বুঝিল যে মায়ের মনে এখন আর ক্রোধ নাই, সেই কারণ সাহস করিয়া বলিল—"আমি ত এখনও ভাত খাইনি মা। আমি স্নান করে, তার পর ভাত খাব।"

জননী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"হা আমার অদৃষ্ট! বাড়ী শুদ্ধ সবাই খেয়েছে, বেলা আড়াইটে হলো, আর এখনও তুই ভাত খাস্‌নি।"

অমলা।—হাঁ মা—ঐ মেয়েটীকে না খাইয়ে, কি করে খাব?

সাবিত্রী।—ওরা তো তোর জাতকুটুম্ব জাত-গুষ্ঠি কেউ নয়! তবে পরের জন্য তোর প্রাণ এত কাঁদে কেন?

অমলা তখন কি উত্তর দিবে? কেন যে পরের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে অমলা নিজেই তাহা জানিত না।

সাবিত্রী পুনরায় বলিল—"ওদের কি আজ ভাত খেতে আছে? আর থাক্‌লেও আমাদের হাঁড়ির ভাত ওকে কি করেই বা দিবি?"

অমলা। মা, ও ত বালিকা। ওকি সে সকল নিয়ম

মান্‌তে পারে? আর আমি শুনেছি, অপাঘাত মৃত্যু হলে, তার আর ওষুধ নিতে হয় না।

সাবিত্রী।—এখন কে সে বিধান আনে? এ বাইরের পাপ ঘরে আনা কেন? এতখানি বেলা হলো, এখনো ভাত না খেয়ে এই সকল হচ্ছে!

অমলা।—মা, আজ ত ঐ মেয়েটীকে নিরিমিষ খেতে হয়, তা আমার ভাত থেকে দুটি দিই না। আহা! ছেলেমানুষ, না খেয়ে মুখখানি শুকিয়ে গেছে।

সাবিত্রী।—আমি তোকে আঁট্‌তে পার্‌বো না, তুই যা জানিস কর্ মা। এখন আর পিত্তি পড়াস্‌নে, শীগ্‌গির দুটী ভাত মুখে দিগে যা।

এই কথা বলিয়া সাবিত্রী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে লাগিল। অমলাই জননীর অসন্তোষের কারণ, সুতরাং অমলা বিষণ্ণমনে পুনরায় সুখদার নিকট ফিরিয়া আসিল। সুখদাকে আহার করাইয়া আপনি যৎকিঞ্চিৎ আহার করিল। আহারান্তে সুখদাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে আপনার শয্যায় শয়ন করাইল। অমলার প্রবোধ-বাক্যের কি মোহিনীশক্তি ছিল, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু দেখিতে দেখিতে সুখদা নিদ্রিতা হইল। তখন অমলা ধীরে ধীরে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া শরৎকুমারীর নিকটে গেল। শরৎকুমারীর মনে যে এখনও সুখ নাই, সে কথা কেবল অমলাই জানিত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অমলা শরৎকুমারীর গৃহে আসিয়া দেখিল যে তখনও শরৎকুমারী নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিতেছে। অমলা সে গৃহে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল—"বউ দিদি।"

বউ দিদি তৎক্ষণাৎ অমলার দিকে ফিরিয়া চাহিল বটে, কিন্তু সে আজ বউ দিদির নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই বলিয়া, তাহার উপরও বউ দিদির একটু অভিমান হইয়াছিল। সেই কারণ অমলাকে দেখিয়া বউ-দিদি এখন কোনরূপ অভ্যর্থনা না করিয়া পুনরায় মুখ ফিরিয়া বসিল। বুদ্ধিমতী অমলা সে ভাব বুঝিতে পারিল। তাড়াতাড়ি শরৎকুমারীর নিকট আসিয়া বলিল—"বউ-দিদি, আজ একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। দাদা আফিস যাবার ঘণ্টা খানেক পরেই—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অমলা চুপ করিতে বাধ্য হইল, কারণ অমলার মুখে এই পর্য্যন্ত শুনিয়া, স্বামীরই কোন অমঙ্গলের সংবাদ মনে করিয়া, শরৎকুমারীর প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। শরৎকুমারী তাহার স্বামীর জন্য সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিত; সুতরাং অমলার মুখে এই পর্য্যন্ত শুনিয়া তাহার

যেরূপ অবস্থা হইল, তাহা দেখিয়া অমলা সে কথা বন্ধ করিয়া বলিল—"দাদার কোন অমঙ্গলের কথা নয়, দাদার বন্ধু পরেশ বাবুর স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন। তাই দাদার আজ আফিস যাওয়া হয় নি। পরেশ বাবুর কেউ নেই কি না; তাই তাঁর একটি ছোট ছেলে আর মেয়ে আমার কাছে দিয়ে গেছেন। আহা! সেই মা-মরা ছেলে-মেয়ের মুখ দেখলেই তাদের জন্য তোমারও প্রাণ কাঁদবে। আমি তাদের জন্য এতক্ষণ তোমার কাছেও আস্‌তে পারি নি। তা তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ বউ দিদি?"

অমলার কথা শুনিয়া শরৎকুমারীর অভিমান কোথায় চলিয়া গেল। পরেশ বাবুর এরূপ বিপদের সংবাদে তাহারও প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু শরৎকুমারীর ঐ যে কেমন দোষ—সে ভাব তৎক্ষণাৎ গোপন করিয়া ফেলিল এবং কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল—"আমি আবার কার উপর রাগ কর্‌বো? তোমাদের দয়ার শরীর, পরের দুঃখে তোমরা ভাই বোনে একবারে আকুল হয়ে পড়, ঘর-সংসারের কথা পর্য্যন্ত তোমাদের মনে থাকে না। আমাদের কঠিন প্রাণ বলেই এখনও বেঁচে আছি।"

শরৎকুমারীর কৃত্রিম ক্রোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, কারণ তাহার কথা কয়েকটি শেষ হইতে না হইতেই কোথা হইতে দুই ফোঁটা চক্ষের জল তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। সে অশ্রুবিন্দুতে তাহার বাহ্য ক্রোধাগ্নিও তৎক্ষণাৎ নিবিয়া গেল। শরৎকুমারী এখন পরদুঃখে যতদূর কাতর না হউক, নিজের দুঃখেই আকুল হইয়াছিল। পরদুঃখে শরৎকুমারীর

প্রাণ কি আকুল হয় না? যে দিবারাত্রি মন-আগুনে পুড়িতে পারে, দুঃখ যাহার চিরসহচর, পরের দুঃখে যে তাহার প্রাণ কাঁদে না, একথা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে শরৎকুমারী অমলার ন্যায় আত্মহারা হইয়া পরের দুঃখে মগ্ন হইতে পারিত না।

শরৎকুমারীর চক্ষে জল দেখিয়া অমলার প্রাণও ব্যথিত হইয়া উঠিল। অমলা বলিল—"কেন বউ-দিদি, মিছে-মিছে ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট করিস্? কেন বৃথা অভিমান করে, নিজের অনিষ্ট করিস্? আমার দাদার মতন বিদ্বান, পরোপকারী—"

অমলার কথায় বাধা দিয়া তৎক্ষণাৎ শরৎকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিল—"চুপ, আর বলিস্‌নে চুপ। যে মা-বোনের সাম্‌নে—সে দিন তেমন মাতালামী করতে পারলে, তার বিদ্যে-বুদ্ধি ও পরোপকারের পরিচয় আর দিতে হয় না। মাতাল বল্লেই সেই সঙ্গে তার সব পরিচয় দেওয়া হয়।"

অমলা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পুনরায় বলিল—"দাদা মাতাল বলে—"

কিন্তু এ আবার কি! শরৎকুমারী এই সময় সগর্জ্জনে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"অম্‌লি! পোড়ারমুখী—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুই আমারই সুমুখে আমার স্বামীকে মাতাল বলিস্!"

অমলা অপ্রস্তুত হইয়া থতমত খাইয়া গেল। শরৎকুমারীর ভ্রম দূর করিবার জন্য কিছুক্ষণ পরে বলিল—"তুমি হঠাৎ রাগ করে উঠলে কেন বউ-দিদি? আমি ত দাদাকে মাতাল—"

শরৎকুমারী পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"আবার!"

অমলার মুখে আর কথা নাই! সে তখন বিস্মিত হইয়া শরৎকুমারীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। অমলা বুদ্ধিমতী হইলেও ভালবাসার এ রহস্য বুঝিবে কিরূপে? বউদিদি তাহার দাদার নাম রাখিয়াছিল—মাতাল। উঠিতে—বসিতে তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াই ডাকিত। আর, তাহারই কথার উত্তরে ঐ কথা মুখে আনিয়া অমলা এত দোষী হইল! কৈ অমলা ত তাহার দাদাকে 'মাতাল' বলিয়া কখন ঘৃণা করে না। সে তাহার দাদাকে পূর্ব্বে যেরূপ ভক্তি করিত, এখনও সেইরূপ ভক্তি করিয়া থাকে। তবে অমলার উপর তাহার বউদিদির এত রাগ কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমলা বুদ্ধিমতী হইলেও চতুরা নহে—অমলা সরলা। আর বিশেষতঃ সে বালবিধবা, সুতরাং সে শরৎকুমারীর প্রণয়রহস্য কিরূপে বুঝিবে? অমলা কিন্তু এই সময় একটা কথা বলিতে ছাড়িল না। অমলা বলিল—"যে কথা শুনলে, তোমার মনে কষ্ট হয়, সে কথা তবে তুমি নিজের মুখে অন্যের কাছে কি করে বল বউদিদি?"

শরৎ।—সাধে বলি—গায়ের জ্বালায় বলি। এম্‌নি করে তাকে গালমন্দ না দিলে আমার গায়ের জ্বালা মেটে না যে!

অমলা।—আমার ঘাট হয়েছে বউদিদি। তোমার মনে কষ্ট হবে জান্‌লে কি আমি সে কথা মুখে আনি?

কি ভাবিয়া শরৎকুমারী এইবার একটু সুস্থির হইয়া বলিল—"দেখ ঠাকুর-ঝি, আমার বাপ বিদ্বান আর সচ্চরিত্র দেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন; আমিও তাঁকে এখনও বিদ্বান আর সচ্চরিত্র বলেই জানি। অনেক সময় এই সব-

ব্যবহারে তাঁর চরিত্রের ওপর সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু অনেক সময় আবার তার মুখে দুই একটি ভাল কথা শুন্‌লেই আমার মনে আর কোন সন্দেহই থাকে না। কিন্তু ঠাকুর-ঝি, এবারকার গতিক আমি ভাল বুঝ্‌ছি না, সেই শনিবার থেকে আমার সঙ্গে একটিও ব্যাকালাপ করে-নি।"

এই কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে শরৎকুমারী কাঁদিয়া আকুল হইল। অমলার নিকট সে হৃদয়-লুক্কায়িত ভাব আর গোপন রাখিতে পারিল না। অমলা তাহার বউদিদিকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"ছি বউদিদি, দাদা পাঁচদিন কথা কন্‌নে বলে, তোমার এত কষ্ট?"

শরৎ।—ঠাকুর-ঝি, স্ত্রীপুরুষে একত্রে থেকে কথা না কয়ে থাকা যে কি কষ্ট—তা তুই কি করে বুঝ্‌বি? এর চেয়ে তোর দাদা মাতাল হয়ে এসে, যদি আমায় গাল দিত, বোধ হয়, তাতে আমার এত কষ্ট হতো না।

অমলা।—আচ্ছা বউদিদি, তুমি কথা কইলেও দাদা তোমার কথার উত্তর দেন না?

শরৎ।—আমি কি তোর দাদার কাছে সেধে কথা কইতে যাবো নাকি?

অমলা।—তাতে দোষ কি?

শরৎকুমারী পুনরায় নিজমূর্ত্তি ধরিল। এইবার যেন একটু রাগিয়া বলিল—"আমার এত দায় নেই। তার ইচ্ছে হয়, সে কথা কইবে, ইচ্ছে না হয়, তায় কথা কয়বার দরকার নেই।"

অমলাকে আমরা বুদ্ধিমতী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমরা বুঝিতেছি যে অমলার সে বুদ্ধির একটা

সীমা আছে। অমলা অন্য সকল কথা বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহার বউদিদির সকল সময়ের সকল কথা বুঝিতে পারে না।

সেই কারণ অমলা পুনরায় বলিল—"বউদিদি, স্বামীর কাছে আবার মান অপমান কি? স্বামীর মানেই স্ত্রীর মান, আর তাঁহারই অপমানে স্ত্রীর অপমান।"

শরৎকুমারী হাসিয়া অমলার গালে একটি ক্ষুদ্র ঠোনা মারিয়া বলিল—"তুই সে দিনকার ছুঁড়ি, তুই স্বামীর মান অপমানের কি ধার ধারিস্ না?"

অমলার গালে কোনরূপ আঘাত না লাগিলেও সে ক্ষুদ্র ঠোনাটা তাহার প্রাণে গিয়া আঘাত করিল। অমলা যে বাল-বিধবা এই কথা অমলার মনে তৎক্ষণাৎ উদয় হইয়াছিল। সুতরাং দেখিতে দেখিতে অমলার মুখখানি বিষণ্ণ হইল। এ বিষণ্ণতার কারণ অমলা নিজে—না শরৎকুমারী?

আমরা জানি অমলা নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে কখন সময় পাইত না। শরৎকুমারী কিন্তু মনে মনে নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া অন্য কথা পাড়িবার জন্য বলিয়া উঠিল—"কই পরেশ বাবুর ছেলে মেয়ে কোথায়? আমার নিজের দুঃখ ভাব্‌বারই সময় পাইনে, তা পরের দুঃখ ভাবি কখন?"

অমলার বিষণ্ণতা অমনি দূর হইয়া গেল! আর কোন কথা না বলিয়া যেখানে সুখদাকে রাখিয়া আসিয়াছিল, সেইখানে শরৎকুমারীকে লইয়া চলিল। পরের দুঃখের কথা মনে হইলে অমলা নিজের দুঃখ তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যাইত।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

পরদিন অতি প্রত্যুষে হীরালাল লালবাজারের পুলিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া শুনিলেন যে দশটার পর করোণারের বিচারালয়ে পরেশনাথের স্ত্রীর মৃত্যু কিরূপে হইয়াছে, তাহার বিচার হইবে। হীরালাল একে এই বিচারের ফল জানিবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন, তাহার উপর মোকর্দ্দমার তদ্বির জন্যও তাঁহার উপস্থিত থাকা বিশেষ আবশ্যক, এই কারণ সেদিনও তাঁহার আফিস যাওয়া হইল না। পরের উপকার করিতে যাইয়া, হীরালাল সকল সময়েই নিজের কাজ ভুলিয়া যাইতেন।

বিচারসংক্রান্তের বিবরণ এ স্থলে প্রকাশ করা আমরা আবশ্যক বোধ করি না, তবে বিচারের ফল যাহা হইল, তাহা প্রকাশ করিতেছি। করোণারের বিচারে নিস্তারিণী যে গলায় দড়ি দিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে, তাহাই স্থিরীকৃত হইল; তবে হীরালাল বাবু এই মোকর্দ্দমার তদ্বির না করিলে কোন মতেই এইরূপ ফল হইত না—একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। কারণ পুলিসের, পক্ষ হইতেই মোকর্দ্দমার বিশেষ রূপে তদ্বির করা হইয়াছিল, আর সে তদ্বিরের যে অর্থ, তাহাও বোধ হয়, স্পষ্ট আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। হীরা-

লাল কেবল শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা যে পরের উপকার করিতেন তাহা নহে আবশ্যক হইলে যথাশক্তি ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না

পরেশনাথ ত পুলিসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল এখন তাহার বাঁধবা কন্যা ও শিশু পুত্রের দশা কি হইবে? একথা কিন্তু প্রথমে হীরালাল বাবুর মনে উদয় হইয়াছিল। পরেশনাথ এখন খুনী মোকর্দ্দমার দায় হইতে উদ্ধার পাইয়া আনন্দে অধীর, সুতরাং তাহার সে সকল কথা ভাবিবার অবকাশ ছিল না হীরালাল প্রথমে পরেশনাথকে তাঁহারই বাড়ীতে সঙ্গে করিয়া আনিলেন এবং বিশেষ যত্নের সহিত সে দিন তাঁহাকে আহারাদি করাইলেন। সন্ধ্যার পর হীরালাল বাবু বলিলেন—"পরেশ, তোমার সংসারের বন্দোবস্ত এখন কিরূপ করবে?"

পরেশনাথ এখন একবারে গঙ্গাজল। তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"আমি ভাই, সে বিষয় কিছু জানি না, তুমি যা ভাল বিবেচনা করবে তাই হবে।"

হীরালাল। তোমার সংসারের কাজকর্ম্ম করবে কে? তোমার ছেলেমেয়ে মানুষ করবেই বা কে? তোমার কি কোন আত্মীয় স্বজন নেই?

পরেশ। তেমন আত্মীয় স্বজন আর কে আছে? যখন সময় ভাল ছিল, তখন অনেক ছিল, এখন আর কেউ নেই।

হীরালাল। তা হলে ত তোমার এক জন রাধুঁনী আর একজন ঝি রাখ্‌তে হবে।

পরেশনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"আমারও

চাক্‌রী বাক্‌রী নেই, এখন তাদের খরচ জোগাই কোথা থেকে ?"

পরেশনাথের এই কথা শুনিয়া হীরালাল বাবু চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রমে গম্ভীর হইতে লাগিল। তিনি যাহার জন্য এইরূপ আকাশপাতাল ভাবিতেছেন, এই সময় সেই পরেশনাথ কিন্তু কিরূপে হীরালাল বাবুর নিকট এক বোতল ব্রাণ্ডির প্রস্তাব করিবে, তাহারই সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আজ এত বড় একটা মোকর্দ্দমার হাত হইতে পরেশনাথ রক্ষা পাইয়াছে; সুতরাং এখন সুরাপান করিয়া আনন্দ করিবার জন্যই তাহার প্রাণ অস্থির। হীরালালের এ সকল কথা এখন তাহার ভাল লাগিবে কেন? পরেশনাথ হীরালাল বাবুকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া কহিল—"ভাই, এখন ও সকল কথা থাক, কাল সকালে সে বিষয়ে একটা যুক্তি করে যা হয়, স্থির করা যাবে। এখন বল্‌ছিলাম কি, কাল থেকে তোমারত বড় কষ্ট গিয়েছে, এখন সে কষ্টের লাঘব কর্‌লে ভাল হয় না?"

পরেশনাথের কথা শুনিয়া হীরালাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমার আর অন্য কোন কষ্টত হয় নি, কেবল কষ্ট হয়েছে, সেই সতীলক্ষীর এরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে।"

তাহার পর হঠাৎ এই সময় একটা কথা তাঁহার মনে উদয় হওয়ায় পরেশের প্রতি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"কি কর্‌লে এ কষ্টের লাঘব হয়, পরেশ?"

পরেশনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া চুপি চুপি বলিল—"তোমার মনটা বড় খারাপ আছে দেখ্‌ছি, একটু খেলে ভাল হয় না?"

পরেশনাথের কথায় হীরালাল মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি! তুমি আবার মদ খেতে চাচ্ছ? যে মদ খেয়ে এই সর্ব্বনাশ করেছ, আবার সেই বিষ খেতে চাচ্ছ? আর কেবল আমার মনই খারাপ হয়েছে—তোমার মনে কি কোন কষ্ট হয়-নি পরেশ? পুলিসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ বটে, কিন্তু এক রকম তুমিই তোমার স্ত্রীকে খুন করেছ বলতে হবে। সেই সতী-লক্ষ্মীর মৃত্যুতে তোমার কি একটুও কষ্ট হয়-নি পরেশ?"

পরেশনাথ তখন বিষণ্নমনে বলিল—"আমার মনেও কষ্ট হয়েছে বৈ কি? আর তুমিও যা বলছ, সে কথাও ঠিক। আমার মতন নরাধম আর কে আছে? আমিই স্বহস্তে স্ত্রীহত্যা করেছি। তুমি আমার যথার্থ বন্ধু ছিলে, তাই এ যাত্রা রক্ষে করেছ। অনুতাপে আমার প্রাণ কেটে যাচ্ছে। কিন্তু ভাই একটি বিষয়ে আমায় ক্ষমা কর, আমায় আজ একটু মদ খাওয়াও। তা নইলে আমার এ নিদারুণ মনোকষ্ট আমি সহ্য করতে পারবো না।"

পরেশনাথের ত এতক্ষণ কোন কষ্ট বা অনুতাপ ছিল না; হীরালাল বাবুর কথায় হঠাৎ এই কষ্ট আর অনুতাপ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? হীরালালবাবু পরেশকে চিনিতেন, সুতরাং পরেশনাথের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন তাঁহার বুঝিতে আর বাকী রহিল না। হীরালাল তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"তোমার যদি যথার্থ অনুতাপ হয়ে থাকে, তবে জীবনে কখন মদ স্পর্শ করবে না প্রতিজ্ঞা কর। মদই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে—তুমি মদ খেয়ে অত্যাচার করেছিলে বলেই ত, সেই সতীলক্ষ্মী মনের দুঃখে তোমায় ফেলে স্বর্গে চলে গেছেন; করোনারের বিচারে সে সকল কথাই ত প্রকাশ হয়েছে।

এখন সে সকল কথা আমার মনে হলে তোমার মুখ দেখতে আমার ঘৃণাবোধ হয়। কেন তোমার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে, তা, বল্‌তে পারি না—কিন্তু তুমি নরকের কীট, তোমার সংসর্গে শত্রু যেন না আসে।”

হীরালালের এইরূপ ভর্ৎসনার পর, পরেশনাথ অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“বাস্তবিক আমি নরকেরই কীট, কিন্তু ভাই, মদ আমি কখন ত্যাগ করতে পারবো না। যে ক'দিন বাঁচবো, মদ খেয়ে কাটাবো; তাহলেই পৃথিবীর এ পাপের ভারও শীঘ্র লাঘব হবে।”

হীরালাল।—দেখ পরেশ, আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি, তুমি এক সময়ে খুব ভাললোক ছিলে, কিন্তু এখন মদই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে। তোমায় আমি অনেক সময় মনে মনে ঘৃণা করি সত্য, আবার তোমার দুঃখ দেখ্‌লে তোমার জন্য আমার প্রাণও কাঁদে। দুদিন তোমায় না দেখ্‌তে পেলে আমি অধৈর্য্য হই। আমার এত বন্ধুবান্ধব থাক্‌তে, অবসর পেলেই কেবল তোমার কাছেই যেতে ইচ্ছে করে। আমি অন্য কাজে বাড়ী থেকে বেরুলেও, ঘুরে-ফিরে কি জানি কেন, শেষে তোমার কাছেই এসে পড়ি। আজও তোমার ভাবনা ভেবেই, আমি অস্থির হয়েছি। তুমি যদি মদ ছাড়্‌তে না পার, তবে তোমার ছেলে মেয়ের দশা কি হবে? না, আমি আর ভাব্‌তে পারি না। কি কুক্ষণেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।”

হীরালালের মনে এখন আর কিছুই স্থান পায় না, তিনি কেবল পরেশনাথের মাতৃহীন পুত্রকন্যার জন্য একমনে চিন্তা

করিতে লাগিলেন। এদিকে পরেশনাথ শোক-ব্যঞ্জক ঘন ঘন কৃত্রিম সুদীর্ঘ নিশ্বাসে সেই স্থলের নিস্তব্ধতা মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ করিতেছিল। অনেকক্ষণ চিন্তার পর হীরালাল বলিলেন—"আমি তোমায় থাক্‌বার স্থান দিতে পারি। আমার বাড়ীর যে খণ্ডটা আমি ভাড়া দিই,এখন সে খণ্ডে কোন ভাড়াটে নেই; এতে আমার মাসে মাসে পোনের টাকা ভাড়া লোকসান হবে, আমি তাও বরং সহ্য কর্‌তে পার্‌বো; কিন্তু এর বেশী আমি আর কোন সাহায্য কর্‌তে পারি না।"

পরেশনাথের তখন আর আনন্দের সীমা নাই; তখন সে আহ্লাদের তোড়ে তাহার সেই কৃত্রিম শোকটা কোথায় উড়িয়া গেল! পরেশনাথ আনন্দে অধীর হইয়া বলিল—"আমি আর কোন সাহায্য চাই না। তোমার বাড়ীতে যদি থাকতে পাই, তা হলে আমার ছেলেমেয়ের বিষয় কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে দু'পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে পারি।"

হীরালাল বলিলেন—"আপাততঃ এখন তাই হ'ক। তার পর অন্য বন্দোবস্ত করা যাবে।"

পরেশনাথ মনে মনে বলিল—"অন্য বন্দোবস্ত আর কিছু করতে হবে না: এতদিন পরে আমার গ্রহ কেটে গেছে দেখছি।"

কিন্তু এত আনন্দের সময় পরেশনাথ একটু সুরাপান না করিয়া কি থাকিতে পারে? পরেশনাথ আনন্দে অন্য সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সুরার কথা ত ভুলিতে পারে নাই! পরেশনাথ বলিল—"ভাই তুমি সব বন্দোবস্ত ভালই করেছ,আমি তোমার ঋণ কখন শুধ্‌তে পার্‌ব না। এখন একটু মদের

বন্দোবস্ত করলেই সব দিক রক্ষা হয়। তোমারও বড় কষ্ট হয়েছে, এস এখন দু'জনে একটু আমোদ করি।"

পরেশনাথের কথায় এবার হীরালাল অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"কি বল্লে পরেশ—আমোদ করি? আজ কি তোমার আমোদ করবার দিন? তোমার অনুতাপ বুঝেছি—আর তোমার কষ্টও বুঝতে পেরেছি। একটু মদ পেলেই তুমি হাতে স্বর্গ পাও। তোমার এত দূর অধঃপতন হয়েছে! তোমায় ধিক্!"

পরেশনাথ তখন আর থাকিতে পারিল না, মুক্তকণ্ঠে বলিল—"ভাই, তুমি ভৎসনা কর, আর লাথিঝ্যাঁটা যা ইচ্ছা মার, আজ একটু মদ আমায় দিতেই হবে।"

হীরালাল।—আমি ত ভাই আর মদ খাবো না। মার মাথার দিব্যিতে যা হয়-নি, স্ত্রীর দীর্ঘনিশ্বাসে যা হয়নি, আজ তোমার ব্যবহার দেখে আমার সে জ্ঞান হয়েছে—মদে আমার ঘৃণা জন্মেছে। যে মদের পরিণাম তুমি—সে মদ না বিষ! সে বিষ ইচ্ছে করে লোকে খায় কেন?

আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, পরেশনাথের নিকট আজ অন্ততঃ কিছু পয়সাও থাকিলে, পরেশনাথ কখনই হীরালালের নিকট এ প্রস্তাব পুনরায় করিতে আর সাহসী হইত না। কিন্তু পরেশনাথের অন্য উপায় কিছুই নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া পুনরায় তাহাকে বলিতে হইল—"তুমি যা বলছ, তা আমিও অস্বীকার করি না; কিন্তু আজ আমায় মাপ করতে হবে। না হয় অন্ততঃ সাড়ে চারি আনা পয়সা আমার ধার দাও; আজ একটু আমায় খেতেই হবে।"

হীরালাল।—আর আমি যদি তোমায় সে পয়সা না দিই, তা হলে কি করে খাবে ?

পরেশ।—যেমন করে হ'ক, সে পয়সা আমায় যোগাড় কর্‌তেই হবে।

হীরালাল।—যদি অন্য কেউ ধার না দেয়, তবে কি করে যোগাড় করবে ?

পরেশ।—আমি চুরি করব—ডাকাতি করব—খুন করব।

হীরালাল শিহরিয়া উঠিলেন! অনেকক্ষণ পরেশনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সে মুখে তখন কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরেশনাথ কখন কপট, কখন সরল। কপট হয় মদের জন্য—সরলও হয় মদের জন্য!

হীরালাল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি সাড়ে চারি আনা পয়সা দিয়া পরেশনাথকে বিদায় করিয়া দিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল বাবুর বাড়ী কলিকাতা, পটলডাঙ্গায়। আমরা শুনিয়াছি, কলিকাতায় ইহাঁদের অনেক দিনের বাস। বাড়ী-খানি দেখিলে তাহার প্রমাণের আর আবশ্যক করে না। পল্লী গ্রামের বাড়ীর ন্যায় রীতিমত দুই মহল বাড়ী এবং বাড়ীর সংলগ্ন বাগান, পুষ্করণী ও খালি জমি প্রভৃতি দেখিলেই, বহুদিনের বাস বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সে সময় কলিকাতার জমীর এত অধিক মূল্য ছিল না। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার জমীর মূল্য কোন কোন স্থলে শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে! সুতরাং এখন গৃহস্থলোক দুই এককাঠা জমীর উপরে দুই মহল বাড়ী প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

হীরালালের বাড়ীর সম্মুখেই অনেকখানি খালি জমী পড়িয়াছিল, প্রজাবিলি করিলে বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হইতে পারিত; কিন্তু বাড়ীর শোভা নষ্ট হইবে বলিয়া হীরালাল বাবু সে জমী বিলি করেন নাই; অথচ সে জমীর শোভার জন্য কোনরূপ ফুল-বাগানের বন্দোবস্তও ছিল না; কেবল স্বভাবজাত নবদুর্ব্বাদলরাশি যেন বাড়ীর সম্মুখে—দুই পার্শ্বে দুই খানি—সবুজ রংএর গালিচা প্যাতিয়া রাখিয়াছিল। সদর

দরজা পার হইলেই ডানদিকে দারওয়ান, বেহারা প্রভৃতি ভৃত্যগণের থাকিবার স্থান এবং বামদিকে একটি বিস্তৃত গৃহ; পূর্ব্বে সে গৃহে কাছারী বসিত, এখন জমীদারীই নাই, তা কাছারী বসিবে কিরূপে? এখন ইহাকে একটা গুদাম ঘরের ন্যায় ব্যবহার করা হয়, অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্য এই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তাহার পরই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। উত্তর মুখে সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিতে হয়। এই প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে বৃহৎ সাতটি খিলানযুক্ত পূজার দালান। দালানের মধ্যেও তিনটা মহল; দালান, দরদালান ও রোয়াক। এইরূপ বৃহৎ দালান কলিকাতায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দালানের কার্য্য অনেকদিন দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল কতকগুলি উটুকো পারাবত সেই দালানে উৎপাৎ করিয়া বেড়ায়। তবে এই বাড়ীর কপোতমাংসপ্রিয় বেহারার অনুগ্রহে সে উৎপাতেরও অনেকটা লাঘব হইয়া আসিয়াছিল। প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে এই দালান এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে এই দালানের সহিত চক-মিলান-বারাণ্ডা, আর উত্তরদিকে অন্দর-বাড়ী। সদর-বাড়ীর বৈঠকখানা প্রভৃতি সমস্ত দ্বিতলের উপর।

সদরবাড়ীর ন্যায় অন্দর বাড়ীও প্রকাণ্ড। তবে ঐ অন্দরের পশ্চিমাংশ এখন কতকটা ঘেরিয়া আর একটা খণ্ড করা হইয়াছে। তবে সে খণ্ড দ্বিতল নহে। হীরালাল বাবুর অন্দরের উত্তরাংশের ঘরগুলি একতলা, আর অন্যান্য সমস্তই দ্বিতল। সেই কারণ পশ্চিমাংশের খণ্ডে, হীরালাল বাবুর অন্দর হইতে যাইতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এই একতালা ঘরের

ছাদের উপর দিয়া যাওয়া যায়। ঐ খণ্ড ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে, সেই কারণ তাহার প্রবেশের দরজা প্রভৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল। তবে গৃহস্থ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভাড়া দেওয়া হইত না। সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ছাদ দিয়া হীরালাল বাবুর অন্দরের মধ্যে আসিতে পারিত, এবং তাঁহার বাড়ীর স্ত্রীলোকগণও ইচ্ছা করিলে ভাড়াটিয়াদের অন্দরের মধ্যে গিয়া তাহাদের স্ত্রীলোকগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিত। কেহ কাহার অন্দরের মধ্যে না গেলেও হীরালাল বাবুর অন্দরের একতালা অংশের ছাদের সহিত ঐ খণ্ডের ছাদ সংলগ্ন থাকায়, এই ছাদে বসিয়াই অনেক সময় উভয় বাড়ীর স্ত্রীলোকগণের কথোপকথন চলিত।

হীরালালের বাড়ীর সম্বন্ধে আমাদের এত কথা বলিবার কিছুই আবশ্যক ছিল না, কেবল পরেশনাথ এখন এই অন্দরের পশ্চিমাংশের খণ্ডে আসিয়া বাস করিতেছে বলিয়াই, আমরা এত কথা বলিলাম। সেই বালিকা কন্যা সুখদা ও সেই শিশু-পুত্রটি লইয়াই পরেশনাথের সংসার! অন্য কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। পরেশনাথ স্বয়ংই রন্ধনাদি করিবে, এইরূপ স্থির ছিল। প্রথম প্রথম পরেশনাথ স্বয়ংই সমস্ত সাংসারিক কার্য্য স্বহস্তে করিত। তাহার পর পরেশনাথ দেখিল—ইহা তাহার পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক, কারণ পরেশনাথের কোনরূপ নির্দ্ধারিত চাকুরী না থাকিলেও, উপার্জ্জনের জন্য সর্ব্বদাই তাহাকে বাহিরে যাইতে হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি —দালালি, মোকর্দ্দমার তদ্বির, প্রভৃতি পরেশনাথের অনেক রকম ব্যবসা ছিল। বাড়ীতে সাংসারিক কার্য্যে

থাকিলে, তাহার এই সকল ব্যবসা মাটী হইয়া যায়; সুতরাং পরেশনাথ কিরূপে সাংসারিক কার্য্য লইয়া সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিতে পারে? এদিকে বেতন দিয়া লোক রাখিবার ক্ষমতাও পরেশনাথের ছিল না, আর বেতন দিতে স্বীকৃত হইলেও কোন দাসদাসী তাহার বাসায় থাকিতে চাহিত না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে সাংসারিক কার্য্যের ভার পড়িল—সেই ক্ষুদ্র বালিকা সুখদারই উপর!

সুখদা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঘর-ধোওয়া, ঝাঁট দেওয়া, বাসন-মাজা প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিত, তাহার পর উনুনে আগুন দিয়া স্নান করিতে যাইত। সুখদা দুগ্ধজ্বাল দিয়া সর্ব্ব প্রথমে সেই ভাইটিকে দুগ্ধপান করাইত, তাহার পর রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। সুখদা হাঁড়িতে চাউল ঢালিয়া দিয়া, যে অবসরটুকু পাইত, সেই সময় ছোট ভাইটীকে লইয়া একটু খেলাও করিত। অনেক সময় রন্ধনাদি শেষ করিয়া তাহাকে পিতার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত। পরেশনাথের বাড়ী ফিরিয়া আসিবার কোন নির্দ্ধারিত সময় ছিল না; কোন দিন দশটার পরেই আসিত, আবার কোনদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আড়াই প্রহর অতীত হইয়া যাইত। বালিকা পিতার ভয়ে অগ্রে আহারও করিতে পারিত না, ক্ষুধায় অস্থির হইলেও সে বালিকার অসাধারণ সহ্যগুণ ছিল।

যাহার যেরূপ অবস্থা, বিধাতা তাহার প্রকৃতিও সেইরূপ ধাতুতে গঠিত করিয়া থাকেন। দশম বৎসরের বালিকা যে এরূপ একটি ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারে, একথা হঠাৎ শুনিলে বিশ্বাস করা যায় না; কিন্তু সুখদা

এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাতে সেই মঙ্গলময় ঈশ্বর তাহাকে এরূপ পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু না করিলে, বোধ হয়, সুখদা আর তাহার ভ্রাতার দেহ এতদিন এ পৃথিবীতে থাকিত না।

আহারের পর সুখদা পুনরায় বাসন-মাজা, ঘর-ধোওয়া প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিত। তাহার পর ছোট ভাইটীকে দুধ খাওয়াইয়া তাহাকে লইয়াই একটু খেলা করিত। আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাঁধিতে বসিত। অনেক সময় সেই ভাইটীকে কোলে লইয়াই তাহাকে রাঁধিতে হইত। যদি কৌশলে তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারিত, তবে সেই রন্ধনশালার এক ধারেই তাহাকে শয়ন করাইয়া, সুখদা রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। এ শিশুও আপন অবস্থা কতক বুঝিত; সুতরাং অন্যান্য শিশুর ন্যায় ইহাকে সর্ব্বদাই কোলে লইয়া থাকিতে হইত না। সেরূপ হইলে সুখদার যন্ত্রণার সীমা থাকিত না।

সন্ধ্যা হইলে সুখদার প্রাণের ভিতর কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইত; এই সময় প্রাণের ভিতর বালিকা এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিত। সুখদার পিতা বাড়ী ফিরিয়া আসিতে যত রাত্রি হইত, বালিকার যন্ত্রণার ততই বৃদ্ধি দেখা যাইত। অনেক সময় বালিকা ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া থাকিত। বালিকা কি ভূতের ভয়ে ভীত হইত? সুখদা যে অবস্থায় পড়িয়াছে, সে অবস্থায় ভূতের ভয় থাকিতে পারে না। সুখদা পিতার ভয়ে এই সময় যেরূপ ভীত থাকিত; তাহাতে ভূতের ভয় তাহার মনের মধ্যে কোন মতেই স্থান পাইতে পারে না; সন্ধ্যার পর তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় পিতার ভয়েতেই পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

সে ভয়ের কারণও বলিতেছি। পরেশনাথ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সুরাপান করিয়া বাড়ীতে আসিত, তবে যেদিন তাহার যেরূপ অর্থ হাতে থাকিত, তাহার পানের মাত্রাও সেইদিন সেইরূপ হইত। পিতার বাড়ী ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইলে সুখদার প্রাণ উড়িয়া যাইত; কারণ সেই দিনই পরেশনাথ অধিক মাত্রায় সুরাপান করিত। এরূপ অবস্থায় সুখদা সাংসারিক এই গুরুতর পরিশ্রমের পর সেই নিষ্ঠুর পিতার হস্তে প্রহার পর্য্যন্তও খাইত। আচ্ছা, সুখদার এ পৃথিবীতে কি কোন সুখ ছিল না? কেহ কি তাহার সাংসারিক কার্য্যে সাহায্যও করিত না? কেহ কি তাহাকে আদরযত্নও করিত না? বাস্তবিক যদি এইরূপ হইত, তবে এত দিন সুখদা কি জীবিত থাকিতে পারে? এক দেববালা সুখদার সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। পক্ষী যেমন আপন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে তাহার শাবককে যত্নে রক্ষা করে, সেই দেববালা সেইরূপ যত্নের সহিত সর্ব্বদাই সুখদাকে রক্ষা করিত। সে দেববালা অন্য কেহ নহে, সে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিতা বালবিধবা অমলা!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরেশনাথের পরিণাম দেখিয়া হীরালালের চৈতন্য হইয়াছিল, কিন্তু শরৎকুমারীর সহিত তাহার মন-মালিন্য এখনও দূর হয় নাই। হীরালাল এখন নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই কারণ তিনি এখন সে মন-মালিন্য দূর করিবার জন্য ও উৎসুক। কিন্তু শরৎকুমারীর অভি-মানের এখনও হ্রাস হয় নাই; সেই কারণ হীরালালের সহিত এখনও তাহার বাক্যালাপ ছিল না। স্ত্রী-পুরুষে রাত্রে এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, অথচ তাহাদের মধ্যে কোন বাক্যালাপ ছিল না. এটা যে বড়ই অশুভ লক্ষণ, তার আর সন্দেহ নাই।

হীরালালের ঘাড়ের ভূতটা এখন তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং হীরালাল এখন সে কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। এক দিন রাত্রে হীরলাল সস্ত্রীক শয্যায় শয়ন করিয়া এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং স্ত্রীপুরুষে এইরূপ, নীরবে থাকার যে অসহ্য যন্ত্রণা,—তাহাও বিশেষরূপে ভোগ করিতেছিলেন। তিনি যে নিদ্রা যাইতেছেন না, সে কথা শরৎকুমারী যাহাতে বুঝিতে পারে, প্রথমে তাহার জন্য

উপায় অবলম্বন করিলেন; তাহার পর—তিনি যে প্রাণের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন—বাহিরে সে যন্ত্রণা-সূচক ভাবও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তত্রাচ শরৎকুমারীর অভিমান আর ভাঙ্গিল না!

সে সময় কি শরৎকুমারী সুখে নিদ্রা যাইতেছিল? শরৎ-কুমারী এ সময় যদি সুখে নিদ্রা যাইতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু শরৎকুমারী ত নিদ্রা যাইতে পারে নাই, শরৎকুমারীও শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে ছিল। তাহার প্রাণের ভিতরও সে যে কি এক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তবে শরৎকুমারী বাহিরে সে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল না। বাহিরে সে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইলে, শরৎকুমারীর পক্ষেই মঙ্গল ছিল, সুতরাং শরৎকুমারী সে পথে যাইবে কেন? নিয়তিকে কে লঙ্ঘন করিতে পারে বল?

হীরালাল অধিকক্ষণ আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহার প্রাণের ভিতর একটা ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখন হীরালাল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"শরৎ!"

তৎক্ষণাৎ সেই গভীর রাত্রের নীরব ও নিস্তব্ধ প্রকৃতি কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনি উত্তর করিল—"শরৎ।"

আর কোন উত্তর নাই! হীরালাল স্তম্ভিত হইলেন. অনেকক্ষণ বিস্মিত হইয়া নীরবে রহিলেন। আবার কি মনে ভাবিয়া পুনর্ব্বার ডাকিলেন—"শরৎ।"

এবারও কোন উত্তর নাই! তখন হীরালালের হৃদয়ের একটা

বাঁধ অল্প অল্প করিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সুতরাং অন্য চিন্তারও আর অবসর ছিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে হীরালাল শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া শরৎকুমারীর গা ঠেলিয়া ডাকিলেন—"শরৎ।"

কিন্তু এবারও হীরালাল কোন উত্তর পাইলেন না; মানিনীর মান সমুদ্র তখন সেই আদরের সম্বোধনে উথলিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং শরৎকুমারী কি এসময় কোন উত্তর দিতে পারে? হীরালাল এইবার বলিলেন—"শরৎ, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।"

হীরালালের কণ্ঠস্বর করুণরসোদ্দীপক! বাষ্প কণ্ঠে গদগদ-স্বরে ঐ কথা কয়েকটি উচ্চারিত হইল, কিন্তু কই তাহাতেও ত মানিনীর মান ভাঙ্গিল না—শরৎকুমারী অভিমানে একবারে গলিয়া গিয়া ছিল! সুতরাং সে মান এখন কি রূপে ভাঙ্গিবে? দেখিতে দেখিতে তাহার মানসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়া সে ক্ষুদ্র হৃদয় একবারে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল। হীরালালের চক্ষে এইবার জল আসিল, হীরালাল শরৎকুমারীর চরণে লুটিয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।"

শরৎকুমারী এখনও বাহিরে অচল—অটল! কিন্তু ভিতরে অভিমানের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল, সুতরাং শরৎকুমারী কোন উত্তর দিল না!

এইবার হীরালাল কিন্তু অধিকতর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। একটা অসহ্য যন্ত্রণা তখন পুনরায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ক্রোধে, ঘৃণায় ও লজ্জায় তখন তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই শয্যা হইতে একবারে লাফাইয়া ঘরের মেজের উপর পড়িলেন। উন্মত্ত হৃদয়-

:বগ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। হীরালাল সে গৃহে আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারই শয্যা-গৃহ এখন তাহার পক্ষে নরকসদৃশ্য মনে হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শরৎকুমারী—আবার বলি ফের—ফের—ফের। একবার তোমার হৃদয়সর্ব্বস্ব স্বামীর প্রতি ফিরিয়া চাও। একবার একটি মাত্র কথা কহিয়া তাহার উদ্বেলিত হৃদয়কে শান্ত কর। কিন্তু শরৎকুমারী তখনও অভিমানে হিতাহিত জ্ঞানহারা! সুতরাং শরৎ এখন আর আমাদের কথা শুনিবে কেন?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়েন বটে, কিন্তু বাড়ীর বাহির হইলেন না; পরেশনাথ যে খণ্ডে থাকে, সেই খণ্ডে আসিয়া পরেশনাথকে ডাকিলেন। পরেশনাথ হীরালালের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। হীরালাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"পরেশ, তোমার ঘরে মদ আছে?"

পরেশ বিস্মিত হইয়া হীরালালের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; হীরালাল পুনরায় বলিলেন—"এখন যদি তুমি আমায় একটু মদ খাওয়াতে পার, তবে যথার্থ বন্ধুর কাজ কর।"

এইবার পরেশনাথ কথা কহিল—"তার আর ভাবনা কি—কলকাতা সহরে সমস্ত রাত্রি—যখনই মনে করবে—তখনই মদ পাওয়া যায়।"

হীরালাল মনে মনে সহরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—"কিন্তু এখন আমার কাছে টাকা নেই; হয় তোমার দোকান থেকে ধার করে আন্‌তে হবে, না হয় তোমার কাছে যদি টাকা থাকে, আমায় দুটো টাকা ধার দাও, কাল সকালে আমি তোমায় দশ টাকা দেবো।"

দৈব ঘটনায় পরেশনাথের নিকট তখন টাকাও ছিল, সুতরাং পরেশনাথ আনন্দের সহিত বলিল—"তা এখনি হচ্চে; কিন্তু তোমার ব্যাপারখানা কি? হঠাৎ এত রাত্রে এ খেয়াল চাপ্‌লো কেন? তুমি যে ছাড়্‌তে পার্‌বে না, তা আমি জান্‌তুম। এ জিনিসের মজাই এই—যে একবার ধরেছে,সে কি আর ছাড়্‌তে পারে?"

হীরা। ও সকল কথা থাক্; এখন তুমি শীগ্‌গির যাও, দেরী করলে আমার প্রাণ যাবে, এইটি মনে রেখো।"

হীরালালের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া, পরেশনাথ পুনরায় একবার হীরালালের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সে সময় সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। পরেশনাথ তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া টাকা লইয়া দৌড়িল। এমন সময় হীরালাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমায় কতদূর যেতে হবে?"

পরেশনাথ তাড়াতাড়ি উত্তর করিল—"দূরে যাব কেন—এই সাম্‌নের দোকান থেকেই আন্‌বো।"

হীরালাল বড়ই অধৈর্য্য। সেই কারণ এইবার যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"ও দোকান ত নয়টার পরই বন্ধ হয়ে যায়।"

পরেশনাথ হাসিয়া বলিল—"নয়টার পর সব দোকানই বন্ধ হয়, কিন্তু বিক্রি বন্ধ হয় না।"

উপরোক্ত কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে পরেশনাথ একবারে গৃহের বাহিরে আসিয়া পড়িল; তখন হীরালাল একাকী বসিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রোধ, অভিমান, ঘৃণা

লজ্জা, অপমান একত্রে যুগপৎ হীরালালের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, হীরালাল প্রাণের অসহ্য যন্ত্রণায় তখন একবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য! এ সময় মদের পরিবর্ত্তে বিষ পাইলেও সে বিষ পান করিতে হীরালাল কুণ্ঠিত হইতেন না। হীরালাল তখন মনে মনে বলিতেছিলেন—"এত তেজ! এত অহঙ্কার! আমায় এতদূর তাচ্ছল্য! আচ্ছা, থাক্—এর প্রতিশোধ আমি নেবো—নেবো—নেবো। এত অভিমান নয়; এ তাচ্ছল্য—ঘৃণা—অবজ্ঞা; পায়ে পর্য্যন্ত ধর্‌লুম, তবুও অভিমান ভাঙ্গলো না। আচ্ছা, থাক্—থাক্—থাক্।"

এমন সময় পরেশনাথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। হীরালাল পরেশনাথকে দেখিয়া বলিলেন—"আমায় এক গেলাস শীগ্‌গির করে ঢেলে দে ভাই।"

আসন্নমৃত্যু রোগীকে যেরূপ তাড়াতাড়ি ঔষধ সেবন করান হয়, পরেশনাথ সেইরূপ তাড়াতাড়ি এক গেলাস সুরা ঢালিয়া প্রথমেই হীরালালকে দিল। হীরালাল বিশেষ আগ্রহের সহিত তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিয়া শূন্য গেলাসটি পরেশনাথের হাতে দিলেন। তাহার পর পরেশনাথও পান করিল।

এইরূপ দুই তিন বার চলিয়া গেল, তত্রাচ হীরালাল আজ ক্রমেই যেন গম্ভীর হইতে লাগিলেন। আজ আর তাহার সে রসিকতা, বাক্‌পটুতা বা চপলতা কিছুই নাই। মুখে কথা পর্য্যন্ত ছিল না! এই সময় হীরালালের প্রাণের ভিতর যে একটা আনন্দের ফোয়ারা ছুটিত, আজ আর সে ফোয়ারা ছুটিল না; কে যেন আজ তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে!

হীরালাল বাবুর দেখাদেখি পরেশনাথও প্রথমে বিশেষ কোন

আনন্দ প্রকাশ করে নাই; কিন্তু ক্রমেই তাহার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া আসিতে লাগিল, তখন সে স্ফূর্ত্তি সে কতক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে? সুতরাং সে মধ্যে মধ্যে দুই একটা আনন্দের ছুঁচোবাজী ও তুবড়ী ছাড়িতে লাগিল; কিন্তু তত্রাচ হীরালালের প্রাণের ভিতর তাহা গিয়া পৌঁছিল না। পরেশনাথ কিন্তু আর এরূপ নীরবে থাকিতে পারে না। এইবার হীরালালকে বলিল—"এত দিনের পর যদি রোজা খুল্‌লে, তবে এখনও অমন মিইয়ে রয়েছ কেন বাবা? দুই একটা বোলচাল ছাড়, প্রাণটা তর হয়ে যাক।"

হীরালাল। আজ আর আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছেনা পরেশ?

পরেশ। আজ বাবা তোমার রকম সকম দেখে, আমিত একবারে মরে রয়েছি। বলি—ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

হীরালাল। ব্যাপার বড় গুরুতর। আচ্ছা পরেশ, স্ত্রী-লোকের অভিমান কিসে যায় জান?

পরেশ। তোমার স্ত্রীলোকের ধারটায় আমি বড় ধারি না—সংসারের ঐ বিষময় ফলটা এ যাত্রা বিশেশ্বরকে দিয়ে এসেছি বাবা। ও সব তত্ব জানি-নে। তবে মদের নেশা কিসে যায় বল্‌তে পারি; আবার অল্প মদে বেশী নেশা কিসে হয়, তাও বল্‌তে পারি। খাও দাও আমোদ কর বাবা, ও সব ছেঁড়া-নেটা ভেবে, মিছেমিছি মন-খারাপ কর কেন?

হীরালাল এতক্ষণের পর প্রাণের কপাট খুলিলেন—"দেখ পরেশ, আজ প্রায় এক মাস হলো, আমার স্ত্রী আমার উপর অভিমান করে, আমার সঙ্গে কথা কয়-নি; কেবল যে

আমারই দোষ ছিল তা নয়,দোষ আমাদের উভয়েরই ছিল। সেই জন্য আমিও তার সঙ্গে কথা কইনে। কিন্তু স্ত্রীপুরুষে না কথা কয়ে কি চিরকালই থাকা যায়? আমার মনের ভাব—সে আগে একটি কথা কইলেই আমি কথা কই। কিন্তু সে সাধ আমার আর মিটলো না—কাজেই আজ আমি আগে কথা কইলুম, কিন্তু তবুও তার মুখের একটিও কথা শুনতে পেলুম না। শেষে পায়ে পর্য্যন্ত ধরলুম—পরেশ, পায়ে পর্য্যন্ত ধরলুম—।"

হীরালালের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল,অবশিষ্ট কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। পরেশনাথ এই সময় হীরালালের সে হৃদয়ের ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া বিস্মিতস্বরে বলিল—"আরে বলোকি? তোমাকে একটা মানুষের মতন মানুষ বলে জানতুম, তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শ্রীমান—শেষে তুমি একটা মেয়ে মানুষের পায়ে ধরলে?"

হীরালাল পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"পায়ে ধরি তায় ক্ষতি নেই পরেশ, কিন্তু সে পায়ে ধরার ত কোন ফল হয়নি।"

এই কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে হীরালাল কাঁদিয়া আকুল হইলেন। হীরালালকে কাঁদিতে দেখিয়া পরেশনাথের নেশা ছুটিয়া গেল। পরেশনাথ তখন পুনরায় গেলাসে মদ ঢালিয়া অগ্রে আপনি পান করিল, তাহার পর আর এক গেলাস ঢালিয়া হীরালালকে পান করিতে দিল। হীরালাল চক্ষের জল মুছিয়া সেই গেলাসটী পান করিল। যখন হীরালাল একবার কাঁদিয়াছে, তখন আর

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে হীরালাল শয়ন-গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরে—যেরূপ হইয়া থাকে—শরৎকুমারীর চৈতন্য হইল। শরৎকুমারী যে একটা অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, এতক্ষণ পরে মনে মনে তাহা বুঝিতে পারিল। তখন শরৎ হীরালালের অপেক্ষায় প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু হীরালালের ত এখন আর কোন সাড়াশব্দ নাই! শরৎকুমারী ইহা জানিত্ত যে হীরালাল অন্দরের মধ্যেই আছেন; কারণ মাঝের দরজা কিম্বা সদরবাড়ীর দরজা খোলার কোন শব্দই শরৎকুমারী পায় নাই। হীরালাল যখন আজ অন্দরের মধ্যেই আছেন, তখন কি পুনরায় আর একবার ঘরের মধ্যে আসিবেন না? আচ্ছা, ঘরের মধ্যে নাই আসুন—এখন যে একটা সাড়াশব্দ পাইলেই শরৎকুমারী দৌড়িয়া গিয়া তাহার চরণে লুটিয়া পড়ে। কই—কোন সাড়াশব্দও ত নাই! তবে শরৎকুমারীর একমাত্র ভরসা হীরালাল অন্দরের মধ্যেই আছেন। কিন্তু তত্রাচ শরৎকুমারী আর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিল না। শরৎকুমারী ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের আলো জ্বালিল, তাহার পর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া হীরালালকে ত দেখিতে পাইল না; তবে হীরালাল কোথায় গেল?

শরৎকুমারী প্রথমে সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিল, কিন্তু কই ছাদেত হীরালাল নাই! শরৎকুমারী একটু বিস্মিত হইল তখন বিষণ্ন মনে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল; আসিতে আসিতে আপনাকে শত সহস্র গালি দিল—দেবদেবীর নিকট শত সহস্রবার নিজের মৃত্যু প্রার্থনা করিতে লাগিল। এতক্ষণের পর হীরালালের জন্য শরৎকুমারীর প্রাণ একবারে আকুল হইয়া উঠিল। তখন তাহার সেই দারুণ অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল। মণিহারা ফণিনীর ন্যায় শরৎকুমারী অন্দরের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল; শরৎকুমারী তখন মনে মনে আবার বলিতে-ছিল—"কোথায় তুমি? আমায় একবার দেখা দও, আমি এই-বার নিশ্চয়ই আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। একবার আসিয়া আমার এ পাষাণ হৃদয়ে পদাঘাত করিয়া যাও—স্বহস্তে আমার অপরাধের দণ্ড কর।"

শরৎকুমারী উন্মাদিনীর ন্যায় চারিদিক চাহিয়া দেখিল—হীরালাল নাই! তখন হীরালালের অদর্শনই যেন তাহার পক্ষে একটা কঠোর দণ্ড হইল। সে দণ্ডের পরিবর্ত্তে তখন শরৎ-কুমারী প্রাণদণ্ড লইতেও প্রস্তুত! হায় শরৎকুমারী—আমরা তোমায় চিনিতে পারিলাম না।

শরৎকুমারী এইবার একটি দরজার নিকট গিয়া ডাকিল—"ঠাকুর-ঝি!"

আর দ্বিতীয়বার ডাকিতে হইল না; তৎক্ষণাৎ অমলা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—"কি বউ-দিদি?"

শরৎকুমারীর মুখে আর কথা নাই! কি বলিবে কিছুই

ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। কেবল অমলার হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার ঘরের দিকে লইয়া চলিল। পরদুঃখকাতরা অমলা পরের দুঃখ নিবারণের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অমলা একটিও দ্বিরুক্তি না করিয়া উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে শরৎকুমারীর সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। শরৎকুমারী অমলাকে আপনার গৃহে আনিল; সেখানে আসিয়াই অমলা সবিস্ময়ে বলিল—"দাদা ঘরে নাই!"

সঙ্গে সঙ্গে অমনি তখন দাদার জন্য অমলার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অমলা অনিমিষনয়নে তাহার বধূঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শরৎকুমারী এইবার কথা কহিল —"তোমার দাদা ঘরে নেই বলেইত তোমায় ডেকে আনলুম।"

অমলার প্রাণের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। কম্পিতহৃদয়ে ধীরে ধীরে অমলা বলিল—"দাদা কোথায় বউ-দিদি?"

শরৎকুমারী এইবার নিজের মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"দেখিস্, তুই যেন মূর্চ্ছাটুর্চ্ছা যাস্নে। দাদাকে না দেখ্লেই যে তুই অন্ধকার দেখিস্?"

অমলার দেহে এইবার প্রাণ আসিল। প্রথমে বউ দিদির কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার প্রাণে বড় ভয় হইয়াছিল; কিন্তু এবার শরৎকুমারীর কণ্ঠস্বরত আর সেরূপ নয়। তবে নিশ্চয়ই অমলার বুঝিবার ভ্রম হইয়াছিল, অমলা হঠাৎ নিদ্রা-ভঙ্গের পর তাহার কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু অমলার প্রাণ এখনও সম্পূর্ণ সুস্থির হইতেছে না কেন? দাদাকে দেখিবার জন্য তাহার মন এত ব্যাকুল হয় কেন? অমলা পুনরায় বলিল—"দাদা কোথায় গেছেন, বল না বউ-দিদি।"

শরৎকুমারী অম্লানবদনে বলিল—"চুলোয় গেছে। সে কোথায় যায়, আমার কি বলে যায়!"

শরৎকুমারীর সে আত্মগ্লানি—সে মর্ম্মভেদী অনুতাপ ইহারই মধ্যে কোথায় গেল? অমলার সম্মুখে আবার এরূপ বলিতেছে কেন? আমরাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তোমরা শরৎকুমারীকে সহজে চিনিতে পারিবে না।

শরৎকুমারী তাহার পর বলিল—"দাদার জন্য যদি এত অধৈর্য্য হয়ে থাকিস্, তবে তাকে খুঁজে বার্ কর্ না। আমিও বরং তোর সঙ্গে খুঁজবো এখন; তোর দাদা এই অন্দরের মধ্যেই কোথায় লুকিয়ে আছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে শরৎকুমারী অমলার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। সেটানে অমলার অঙ্গে লাগিতেছিল; কিন্তু তখন তাহার প্রাণ দাদার জন্য আকুল, সুতরাং অমলা সে বেদনা অনুভব করিতে পারিল না। শরৎকুমারী তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া বলিল—"এই খানেই কোথায় আছে, শীগ্‌গির খুঁজে বার কর। নইলে এই বারাণ্ডা থেকে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।"

শরৎকুমারী ক্রমে যতই অধৈর্য্য হইতেছিল, ততই তাহার অন্তরের ভাব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। শরৎকুমারী অন্যের কাছে আপনার তেজ ও অহঙ্কার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, কিন্তু অমলার কাছে সকল সময়ে তাহা ঠিক রাখিতে পারিত না। অমলা শরৎকুমারীকে কতক কতক চিনিত; সেই কারণ কি ভাবিয়া বলিল—"বউ-দিদি, আমি

ঘরে যাই, তা হলেই দাদা ঘরে আসবেন এখন। আমার সম্মুখে তিনি হয়ত আস্‌বেন না।"

শরৎকুমারী তখন দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল—"তুইত তাকে যাদু করেছিস। সে তোকে দেখলেই আসবে, আমায় দেখলে বরং আসবে না। শীগ্‌গির খুঁজে বার কর্—কর্—কর্।"

অমলার হস্তে তখন প্রদীপ ছিল। অমলা সেই প্রদীপের আলোকে শরৎকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার যে নয়নে এই, কোধাগ্নি সেই নয়নেরই এক প্রান্তে কিন্তু অশ্রুবিন্দু! একাধারে অগ্নি ও জলের একত্র সম্মিলন! আমরা আবার বলি—শরৎকুমারী কে?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমারী বহুরূপী হউক, আর যাহাই হউক, তাহার নয়নে অগ্নি ও জলের একত্র সমাবেশ দেখিয়া অমলা কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া রহিল! দেখিতে দেখিতে শরৎকুমারীর সে রূপ অদৃশ্য হইল। শরৎকুমারী প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"ঠাকুর ঝি, আমার বোধ হয়, তবে বা ভাড়াটিয়া বাড়ীর দরজা খুলে চলে গেছে, না হয় ওদের ঘরেই আছে। আমি ছাদের ওপর দাঁড়াই; তুই নীচে গিয়ে ওদের দরজা খোলা আছে কি না দেখে আয়, কি কোন সাড়া শব্দ পাস্ কি না শুনে আয়।"

অমলা তাহার বউ দিদির জন্য কি না করিতে পারে? অমলা তৎক্ষণাৎ পরেশনাথের বাড়ীর মধ্যে গেল, এবং নিচে নামিয়াই দাদার কণ্ঠস্বর শুনিয়া শরৎকুমারীকে বলিল—"দাদা ওদের বাড়ীতেই আছেন; সুখদার বাপের সঙ্গে কি কথা কচ্চেন।"

শরৎকুমারী বলিল—"তুই ডাক্‌তে পারলিনে কেন?"

শরৎকুমারী এখন এতই অধৈর্য্য যে, তাহার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। অমলা বলিল—"আমি কি ক'রে ডাক্‌বো বউ দিদি? আমি কি সুখদার বাপের সামনে কথা কই?"

শরৎকুমারী তখন আরো অধৈর্য্য হইয়া বলিল—"তা হ'ক, তুই না হয় এই ছাদের উপর থেকে ডাক্।"

অমলা বলিল—"মাকে না হয়, ডাকৃতে বল্‌বো ?"

শরৎকুমারী আর সে কথার কোন উত্তর করিল না—দৌড়িয়া খাশুড়ীর শয়ন-গৃহে গিয়া ডাকিল—"মা।"

গৃহের ভিতর হইতে খাশুড়ী ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন—"কেন গা, বউ মা ?"

শরৎকুমারী আগ্রহের সহিত বলিল—"একবার শীগ্‌গির উঠে এসো ত।"

বধূমাতার কথা শুনিয়া গৃহিণীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। দরজা খুলিবার সময় হুড়কাটা তাহার কপালে লাগিল। কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তিনি বাহিরে আসিয়াই বলিলেন—"কি হয়েছে গা বউ মা ?"

শরৎকুমারীর মুখে তখন আর কথা নাই। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া অমলা বলিল—"কিছু হয় নে মা। দাদা রাত্রে ঘর থেকে উঠে সুখদার বাপের কাছে গেছেন, তাই বউদিদি দাদাকে ডেকে দেবার জন্ত তোমায় ডাকৃছে।"

সাবিত্রী তখন দুই তিনটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস সজোরে ত্যাগ করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিল—"ঠাকুর সঙ্গে বউ মা ঝগড়া করেছে বুঝি ?"

সে প্রশ্নের উত্তর কে দেবে ? সাবিত্রী তখন বধূমাতাকে মৃদু ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন—"অমন করে কি ঝগড়া করতে হয় মা ? ঠাকুর আমার সোনার ছেলে, সে ত তোমায় কখন

বাপু, কড়া কথা বলো না। তুমি বরং তাকে অনেক সময় যা মুখে আসে, তাই বল। এখনও আর ছেলে মানুষটি নও মা। আমি আর কত দিন বাঁচ্‌বো বল? এ ঘর-সংসার তোমাকেই সব কর্‌তে হবে। আজ কালের ছেলে পিলে—"

শরৎকুমারী নিজে শাশুড়ীকে এখন কোন কথা বলিতে পারে না; অথচ এতদূর অধৈর্য্য যে তাহার স্বামীকে আনিয়া দিয়া শাশুড়ী প্রহার করিলেও শরৎকুমারী অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ উপদেশ দিয়া এখন বৃথা সময় নষ্ট করা শরৎকুমারীর পক্ষে অসহ্য! মুখেই বা শাশুড়ীকে সে কথা কিরূপে বলে? শরৎকুমারী অমলার গা টিপিয়া তাহাকে কি ইঙ্গিত করিল। অমলা তখন জননীর কথায় বাধা দিয়া বলিল—"আগে দাদাকে ডেকে নিয়ে এসো না মা, তারপর সে কথা হবে এখন। দাদা যদি সে দিনের মতন এই রাত্রে কোথাও চলে যান।"

সাবিত্রী আর দেরী করিলেন না; তখন পরেশনাথের বাড়ী গিয়া হীরালালকে ডাকিলেন। হীরালাল জননীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রথমে একটু ভীত হইল; তাহার পর অতি সাবধানে উত্তর করিল—"কেন মা?"

জননী তখন বলিলেন—"আমি বল্‌ছি—তুই ঘরে আয় বাপ।"

হীরালাল ধীরে ধীরে পরেশনাথের ঘর হইতে বাহির হইয়া মাতার কাছে আসিলেন; সেখানে আসিয়া জননীকে বলিলেন—"আমায় ঘরে আস্‌তে কেন বল মা? আমার আবার কিসের ঘর-সংসার? আমার ঘরত তুমি শ্মশান করে রেখেছ মা।"

পুত্রের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া মাতার প্রাণ বড় ব্যথিত

হইল। বধূমাতার অনাদরে পুত্রের যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছে —সেই কণ্ঠস্বরেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। পুত্রকে গৃহে আনিয়া বলিলেন—"বউ মা বড় নির্ব্বোধ, ছেলে মানুষ, কিসে কি হয়, সে বুদ্ধি হয়নি বাবা। তা হলে কি আর তোমায় অনাদর করে? তুমিত আমার নির্ব্বোধ ছেলে নও বাবা। আমি বউমাকে অনেক বুঝিয়েছি, তা আবাগের বেটি কিছুতেই বুঝবে না। এ দিকে মুখে কিন্তু বড়াই করে, সে সব বোঝে।"

এখনও হীরালাল জননীর নিকটও সে মনের কথা গোপন রাখিতে পারিবে না। তাহার প্রাণের ভিতরও যাহা হইতেছিল, এই সময় সকলের সম্মুখে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে হৃদয়ের ভারও লাঘব হইতে পারে। সুতরাং হীরালাল বলিল—"আর বুঝিয়ে দরকার নাই মা! আমি এখন সব ভালরূপই বুঝ্‌তে পেরেছি।"

বধূমাতা সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং তাহার মুখ চাহিয়া দুটো কথা না বলিলে ভাল দেখায় না; আর সাবিত্রী বধূর স্বভাবও ভালরূপ জানিতেন, সুতরাং এইবার বলিলেন—"তা বলে কি এই রাত্রে, ছেলে মানুষ বউটিকে একলা ফেলে তোমার ঘর থেকে উঠে যাওয়া ভাল হয়েছে বাবা? তাই না হয়, আমাদেরই ঘরে থাক, পরের ঘরে গিয়ে এত রাত্রে কি হচ্ছিল বাবা?"

হীরালাল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"আমি তোমার কাছে এক দিন মিথ্যা কথা বলেছিলুম, কিন্তু আর মিথ্যে কথা বলবো না মা। আমি পরেশনাথের কাছে বসে এতক্ষণ মদ খাচ্ছিলুম মা!"

হঠাৎ সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে লোকে যেরূপ শিহরিয়া উঠে, তিনজনেই সেইরূপ শিহরিয়া উঠিল! রাগে শরৎকুমারী কাঁপিতে আরম্ভ করিল। অমলা তাহাকে না ধরিলে বোধ হয়, এতক্ষণ সে পড়িয়া যাইত। অমলার প্রাণ তাহার দাদার জন্য বিশেষরূপ কাঁদিয়া উঠিল; সে তাহার দাদার মনের অবস্থা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। তখন তাহার বউদিদির উপরই বড় রাগ হইল। পুত্রের নিজের মুখেই এই সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া সাবিত্রীর প্রাণ উড়িয়া গেল! সাবিত্রীর মুখে আর কথা বাহির হয় না, অনেক কষ্টে সাবিত্রী বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! তুই এই রাত্রিতে ওখানে গিয়ে আমার মাথা খাচ্ছিলি? তুইত ছেড়ে দিয়েছিলি? আবার ও বিষ কেন খেতে আরম্ভ করলি বাবা? ও যে বিষ—তাকি তুই জানিস্‌নে?"

হীরালাল গম্ভীরস্বরে বলিল—"আমিও বিষ বলে জানি মা। বিষ বলেইত খাই।"

সাবিত্রী বিস্মিত হইয়া বলিল—"কি দুঃখে জেনেশুনে এমন বিষ খাস্‌ বাবা?"

এইবার এককালীন হীরালালের সপ্তদুঃখসমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিল। হীরালাল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার যে কি দুঃখ তা মা তোমায় মুখে আর কি জানাব? যদি এ বুকের ভিতর চিরে দেখো, তা হলে কতক বুঝতে পারবে!"—বলিতে বলিতে হীরালাল কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

পুত্রকে রোদন করিতে দেখিয়া জননী, কি আর স্থির থাকিতে পারেন? মায়ের প্রাণও সেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"ছি বাবা!

তুমিত আমার তেমন ছেলে নও। এই সঙ্গদোষে পড়ে বারজনে তোমায় খারাপ করেছে। পরেশকে আমি আশ্রয় দিয়ে রেখেছি; তার এই কাজ! সে আমার বাড়ীতে থেকে আমারই সর্ব্বনাশ করছে!"

হীরালাল চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"না মা, পরেশের কোন দোষ নাই। আমি ইচ্ছে করে আজ মদ খেয়েছি।"

জননী বিস্মতনেত্রে পুত্রের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"তোমায় আমার মাথার দিব্য, তুমি আর কখন খেয়ো না বাবা। এবার খেলে আমার মরা মুখ—"

হীরালাল মাতার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"তুমি আর দিব্যি দিও না মা। আমি তোমার কুসন্তান জন্মেছি। আমা হতে তোমার আর কোন কাজ হবে না। আমি মাতাল, আমাকে তোমরা সকলে ঘৃণা কর। আমি বংশের কুলাঙ্গার। আমি যখন তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, তখন আমার নরকেও স্থান হবে না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি—আমি অনেক প্রতিজ্ঞা করেছি—কিন্তু ঐ সর্ব্বনাশী থাকতে——"

হীরালাল আর বলিতে পারিল না, ক্রোধে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। এই সময় শরৎকুমারী ও আর থাকিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"মা, ওর কান্না দেখে, তুমিও কাঁদেছো যে! ওকি কান্না? ও মাতলামী করছে বুঝতে পাচ্ছ না? মা-ব'নের সামনে মাতলামী করতে লজ্জা করে না? গলায় দড়ি!"

হীরালাল তৎক্ষণাৎ আরক্তনয়নে শরৎকুমারীর দিকে এক-

বার চাহিল ; কিন্তু কি মনে করিয়া সে রাগ সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—"মা, আমি তোমার বিছানায় গিয়ে শুইগে। তোমরা আমার ঘরে গিয়ে শোও।"

হীরালাল আর সেখানে রহিল না,—তৎক্ষণাৎ তাহার জননীর শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। আজ শরৎকুমারী বড় আশায় নিরাশ হইল।
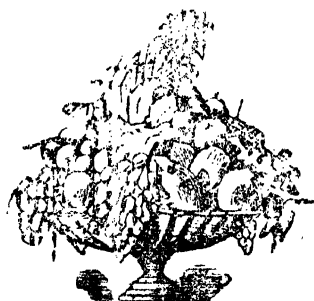
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

এইবার রীতিমত হীরালালের অধঃপতন আরম্ভ হইল। হীরালাল বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইলেও স্বইচ্ছায় নিজের অধঃপতন নিজেই আরম্ভ করিয়া দিল। ক্রমে ক্রমে অপরাহ্নে মধ্যাহ্ন দিবাকরের যেরূপ অধঃপতন হয়, ক্রমে ক্রমে হীরালালেরও সেই-রূপ অধঃপতন হইল। অধঃপতনের পর দিবাকরের সে পূর্ব্বতেজ যেমন আর থাকে না; হীরালালেরও হৃদয়ের সে পূর্ব্বতেজ ও এখন আর নাই। সহস্র কর থাকিতেও দিবাকর যেমন নিজের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করে না, সহস্র উপায় থাকিতে হীরালালও সেইরূপ নিজের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই আর করিল না। স্ত্রীর উপর ক্রোধান্ধ হইয়া হীরালাল ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের নিম্নস্তরে আসিয়া নামিতে লাগিল। অথচ সে স্ত্রী পতিপরায়ণা ও সাধ্বী। তাহার পতিব্রতা ও পতিপ্রেম কেবল অভিমান-ভস্মে আবৃত আছে মাত্র। এদিকে স্বামীরও পত্নীর প্রতি ভালবাসা কম ছিল না। উভয়ের দাম্পত্য প্রণয়ের কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ঘটনাচক্রে পড়িয়া স্বামী স্ত্রীর হৃদয় বুঝিল না, স্ত্রীও

স্বামীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিল না। উভয়েই সুখের পরিবর্ত্তে কাল্পনিক দুঃখ সৃজন করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিবানিশি ভোগ করিতে লাগিল। আমরা ইহাকে নিয়তি বলিব, না অদৃষ্ট বলিব?

নিয়তি হউক, আর অদৃষ্টই হউক—আমরা কিন্তু এই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কাহাকে দোষী করিব—তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। স্বামীর কি স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ছিল না? ভালবাসা থাকিলে কি হইবে—স্বামীর মর্ম্মান্তিক দুঃখ এই যে তিনি স্ত্রীর নিকট সে ভালবাসার প্রতিদান পাইবেন না। এ দুঃখ বড় সহজ দুঃখ নহে। স্ত্রীরও সেইরূপ যথার্থ পতিভক্তি ছিল, কিন্তু স্ত্রীর মর্ম্মভেদী দুঃখ এই যে সে স্বামীর ভালবাসায় সম্পূর্ণ বঞ্চিতা! পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? এখন ঘটনাচক্রের কি অপূর্ব্ব কৌশল দেখিলে? আমরা সেই জন্যই বলিতেছিলাম—এই দম্পতিদ্বয়ের মধ্যে আমরা কাহাকে দোষী করিব—তাহা ভাবিয়া স্থির

আমরা হীরালালকে পরোপকারী ও দয়ালু বলিয়া পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু এখন তাহার সে পরোপকার আর দয়ার কার্য্যক্ষেত্র কেবল এক পরেশনাথ। অন্য কেহ বড় সে দয়া ও পরোপকার এখন আর দেখিতে পায় না। কারণ, হীরালালের প্রবৃত্তি পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে থাকিলেও, হীরালাল এখন অন্য কাহার সংসর্গে বড় আসিত না। সুতরাং তাহার সেই পরোপকার ও দয়ার কার্য্যক্ষেত্র এক পরেশনাথ ব্যতিত আর কে হইতে পারে? আমরা সেই জন্যই বলিতেছিলাম—হীরালালের পরিবর্ত্তন আর বাকি কি?

হীরালাল যে সুরাপায়ী, এখন তাহা জানিতে কাহার আর বাকি ছিল না। সুতরাং হীরালালেরও সে লজ্জাভয় আর নাই। এখন হীরালাল প্রকাশ্যে আপন বৈঠকখানায় প্রতিদিন নিয়মিত-রূপে সুরা পান করিত। হীরালাল কি তাহার নিজের অধঃ-পতন নিজে বুঝিতে পারিত না? হীরালাল সকলই বুঝিত; কিন্তু মনে কোনরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতে দিত না। হীরা-লালের মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই—শরৎকুমারীর অবজ্ঞা ও ঘৃণাই তাহার এই অধঃপতনের কারণ; সুতরাং হীরালাল এই কারণ দর্শাইয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিত। বাস্তবিক একটা রাবণের চিতা দিবারাত্রি হীরালালের হৃদয়মধ্যে জ্বলিত। হীরালালের মনের বিশ্বাস সুরা পানে সে জ্বলন্ত চিতা নির্ব্বাণ হইবে। এই ভ্রমই হীরালালের অধঃপতনের কারণ।

শরৎকুমারীর কথা আমরা আর কি বলিব? শরৎকুমারী ও এখন আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল; শরৎকুমারী এখন অভিমান ত্যাগ করিবার জন্যও প্রাণপণে চেষ্টা করিত; কিন্তু হীরালালকে দেখিলেই কোথা হইতে তাহার অভিমান-সাগর উথলিয়া উঠিত। আর কেবল কি অভিমান? সে অভিমানের সঙ্গে অহঙ্কার, তেজ ও দর্পও পূর্ণমাত্রায় মিশ্রিত ছিল। এখন শরৎকুমারীর এ অহঙ্কার, তেজ এবং দর্প কিসের জন্য? এই কথাটা বুঝাইতে পারিলেই, শরৎকুমারীর চরিত্র-সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝিতে পারা যাইবে। শরৎকুমারীরত এখনও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, সে পক্ষে তাহার কোন ত্রুটি নাই; শরৎকুমারীর স্বামীর ন্যায় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান

ও পরোপকারী স্বামী আর কাহার আছে? ইহাই শরৎকুমারীর অহঙ্কার, তেজ ও দর্প মিশ্রিত অভিমানের কারণ। এখন তোমরা শরৎকুমারীর ভুল বুঝিলে?

হীরালালের আর শরৎকুমারীর অবস্থা ও দুঃখ এক প্রকার বর্ণনা করা যায়, কিন্তু অমলার অবস্থা ও দুঃখত বর্ণনা করা যায় না। অমলা সকলই বুঝিতে পারিতেছিল, এবং প্রাণপণে প্রতি-কারের চেষ্টাও করিত; কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে চেষ্টার কোন ফলই হইত না। অথচ তাহার দাদা ও বউ-দিদির জন্য অমলার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত। অমলার দুঃখের সীমা আছে কি?

একদিন অমলা শরৎকুমারীকে বলিল—"বউদিদি, তুমি একটু নরম না হলেত সব দিক নষ্ট হয়।"

শরৎকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"সব দিক হবার আর বাকি কি?"

অমলা।—বউদিদি, তুমি চেষ্টা করলেই, এখনও সব দিক রক্ষা হতে পারে।

শরৎ।—আমি কি চেষ্টা করবো?

অমলা।—তুমি দাদার মনের মতন হও—তিনি যাতে সুখী হন, তাই কর।

শরৎ।—মন না পেলে মনের মতন কাজ কি করে করবো? কিসে সুখী হন, আর কিসে অসুখী হন, আমি কি করে জানবো?

অমলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সেকি বউদিদি!—তুমি তাঁর স্ত্রী, তুমি চেষ্টা করলেই তাঁর মন পাবে—কিসে সুখী হন, তাও জানতে পারবে।"

শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"তিনি আপনার

শুমরে থাক্‌বেন, আর আমি বুঝি তাঁর মন পাবার জন্যে খোসামোদ করে বেড়াব ?"

অমলা।—সে খোসামোদে কি তোমার অপমান আছে বউদিদি ? স্বামীর কাছে স্ত্রীর আবার মান অপমান কি ?

অমলার এই কথা শুনিয়া শরৎকুমারী রাগান্বিত হইয়া বলিল, —"তোর আর আমায় সে বিষয়ে উপদেশ দিতে হবে না; যদি তোর কাছে আমায় সে উপদেশ নিতে হয়, তবে আমার গলায় দড়ি।"

শরৎকুমারীকে রাগান্বিত দেখিয়া অমলা বড় অপ্রস্তুত হইল। অমলা তখন মিনতি করিয়া বলিল—"তুমি রাগ কর কেন বউদিদি ? তোমার কষ্ট দেখে, আমার প্রাণ বড় কাঁদে, তাই আমি তোমায় কোন কথা না বলে থাক্‌তে পারি না। আমাদের সুখের সংসার দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে দেখ্‌ছ বউদিদি ?

অমলা আর চক্ষের জল রাখিতে পারিল না; অমলার কণ্ঠস্বরে শরৎকুমারীর দৃষ্টি অমলার প্রতি আকৃষ্ট হইল। শরৎ চাহিয়া দেখিল,—চক্ষের জলে অমলার বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে! সে চক্ষের জল দেখিয়া শরৎকুমারীর ক্রোধ কোথায় উড়িয়া গেল। শরৎকুমারী বলিল—"ঠাকুর-ঝি, আমার জন্যে যে তোর প্রাণ কাঁদে তা কি আমি জানিনে ? তুই আছিস্—তাই আমি এখনও বেঁচে আছি। তা না হলে আমার কি বেঁচে থাক্‌বার কথা ? তোকে অনেক সময় আমি অনেক মন্দ কথা যে বলি, সে কেবল আমার মনের অবস্থা ঠিক থাকে না, আর তোকে ভালবাসি বলেই। তুই না থাক্‌লে, এত দিন যে আমি পাগল হয়ে যেতুম, ঠাকুর-ঝি।"

শরৎকুমারীও আর থাকিতে পারিল না। অজস্র অশ্রুবিন্দু অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল। সে দৃশ্য অমলার প্রাণে বড় আঘাত করিল। অমলা নিজে পরের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করে বটে, কিন্তু পরের চক্ষে একবিন্দু অশ্রুও দেখিতে পারে না! অমলার সান্ত্বনায় শরৎ-কুমারী একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"অমলা, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমার ত কষ্ট পাবার কথা নয়, কেবল অদৃষ্টের দোষেই কষ্ট পাই।"

অমলা এইবার সাহস করিয়া বলিল—"বউদিদি, কেবল অদৃষ্টকে দোষ দিলে কি হবে? অনেক সময় আমাদের নিজের দোষেই অদৃষ্ট মন্দ হয়। তুমি চেষ্টা করলে তোমার স্বামীকে কি ভাল করতে পার না বউদিদি?"

শরৎকুমারী অমলার এই উত্তেজিত কথায় তাহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সে মুখের ভাব দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"অমলা, আমি তোর কথাই শুনবো। আজ থেকে আমি সেই চেষ্টাই করবো।"

এখন শরৎকুমারীর মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন দেখিয়া অমলার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

আজ শনিবার, রাত্রি দুই প্রহরের সময় হীরালাল বৈঠকখানা হইতে বাড়ীর ভিতর আসিলেন। বহুকালের পর আজ শরৎকুমারী স্বামীকে আহারাদি করাইবার জন্য তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল; হীরালাল আহার করিবেন কি—অকস্মাৎ শরৎকুমারীর এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া গেলেন! এই সময় একটা ঘোরতর সন্দেহও তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। যে শরৎকুমারী তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না, আজ সেই শরৎকুমারী তাঁহাকে স্বহস্তে আহার করাইবার জন্য রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া কেন? মনে কোন কু-অভিসন্ধি নাইত? এই সকল আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে বিষ থাকিতে পারে না কি? শরৎকুমারীর কার্য্য দেখিয়া হীরালালের মনে তখন এইরূপ একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহের উদয় হইল। আজ শনিবার হইলেও যে তাঁহার জ্ঞানের ব্যতিক্রম হয় নাই, সেই জন্য আপনার অদৃষ্টকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে কোন আহারীয় দ্রব্য আজ তিনি স্পর্শও করিবেন না।

হীরালালকে শয়ন করিতে যাইতে দেখিয়া শরৎকুমারী বলিল —"আমি তোমার খাবার নিয়ে বসে আছি, তুমি আগে খাও।"

যে কারণেই হউক, শরৎকুমারীর এ কথাগুলিও অস্পষ্ট কিন্তু হীরালাল তাহার এই অর্থ করিল যে, নিশ্চয়ই হবে মনের মধ্যে কোন কু-অভিসন্ধি আছে। সুতরাং হীরালালের বড় রাগ হইল, তখন উত্তর করিলেন—“খাবার নিয়ে বসে আছ, তাত দেখ্‌তে পাচ্ছি, এখন মৎলবটা কি প্রকাশ কর বল দেখি ”

শরৎ। তোমায় আগে খেতে হবে, তার পর শুতে পাবে।

হীরালাল। একবারে জন্মের মত শুতে হবে না কি?

শরৎকুমারী স্বামীর একথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। তত্রাচ তাহার প্রাণে একটা আঘাত লাগিল। শরৎকুমারী হীরালালের মুখের প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল; তাহার পর বলিল—“আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পারছি না।”

হীরালাল তখন [illegible] হাসি হাসিয়া বলিল—“আমি কিন্তু তোমার কথা, ভাব, আজ সবই বুঝ্‌তে পারছি ”

শরৎকুমারী এইবার অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিল—“আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি, আমি তখন সে সব বুঝ্‌তে পারি নি, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।”

হীরালাল তখন একটা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। শরৎকুমারী কাঁদিতেছে, আর হীরালাল হাসিতেছে! এ হাসি-কান্নার অর্থ আপনারা বুঝিতে পারিলেন কি? সে হাসি থামিলে হীরালাল বলিলেন—“এখন আয়োজনটা কি করেছ বল? [illegible] এতে মিশিয়ে রেখেছ? আর কত খেলে তোমার [illegible] হবে বল?”

শরৎকুমারী এ কথার আর কি উত্তর দিবে? [illegible] তখন রোদন আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে শরৎকুমারীর এক ফোঁটা

চক্ষের জলে যাহা হইত, এখন অবিশ্রান্ত অশ্রুবিন্দুতেও তাহা হইল না! হায় শরৎকুমারী! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? এ যে তোমার রোগীর মৃত্যুর পর ঔষধ সেবন করান হইতেছে। শরৎকুমারী কিন্তু আর কোন কথা বলিল না, এখন তাহার অনেক কথা মনে হইতে লাগিল, কিন্তু মুখে কোন কথাই আসিল না হীরালালের মন কিন্তু এখন বড় প্রফুল্ল। হীরালাল প্রফুল্লমনেই বলিলেন—"আর মায়া-কান্না কাঁদবার দরকার নাই, বিষ খেয়ে মরতে প্রস্তুত আছি, তবু তোমার মায়া-কান্না দেখতে পারবো না।"

শরৎকুমারী তখন আর থাকিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। হীরালালের তাহাতে আনন্দের সীমা নাই। সেই পরদুঃখকাতর হৃদয় এখন আপনার স্ত্রীর দুঃখে আনন্দে অধীর! শরৎকুমারী এইবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না করলে, আমি এ প্রাণ আর রাখবো না।"

হীরালাল তখন আরম্ভ করিল—"ছি! শরৎকুমারি ছি! তোমার এই কাজ? যে তোমার দাসানুদাসেরও যোগ্য নয়, যে একদিন এইরূপ তোমার পায়ে ধরে, কত মিনতি করে, ক্ষমা চেয়েছিল, যার দিকে সে সময় তুমি একবার ফিরেও চাও-নি, আজ কি না তুমি তারই পায়ে ধরে কাঁদছো! ছি! ছি! ছি! তোমার এমন মতিগতি কেন হলো শরৎকুমারি? তোমার সে অহঙ্কার—সে তেজ—সে দর্প এখন কোথায় গেল? এমন করে কি তোমার কাঁদা শোভা পায়? যে এক সময়

তোমারই অনুগ্রহ লাভের জন্য। তোমার পিছু পিছু ফিরেছে, যে তোমার মুখে একটী ভাল কথা শুনতে পেলে, স্বর্গ হাতে পেতো, আজ কি না তুমি তারই পায়ে পড়ে কাঁদছো। এ তোমার মান না অপমান শরৎকুমারি? এতে তোমার মানের লাঘব হবে—না গৌরব বৃদ্ধি হবে শরৎকুমারি?"

হীরালালের উপরোক্তরূপ শ্লেষবাক্যে শরৎকুমারী নীরবে রোদন ভিন্ন আর কোন উত্তরই পাওয়া গেল না। এদিকে হীরালালের আনন্দের মাত্রাও বৃদ্ধি ভিন্ন কিন্তু হ্রাস হইল না। হীরালাল পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"আর নয়, আমার পা ছেড়ে দাও। মনে করে ছিলুম—ঘরে এসে ঘুমুবো, তা অদৃষ্টে নেই। এখন ছেড়ে দাও আমি প্রাণ নিয়ে পালাই। তুমি যা মনে কচ্ছো, তা নয়, আমি মদ খাই বটে, কিন্তু এখন আর অজ্ঞান হয়ে পড়ি না আমার বিলক্ষণ জ্ঞান থাকে। তোমার কার্য্যোদ্ধার হলো না বলে, আমিও দুঃখিত হলুম এখন আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাহিরে গিয়ে একটু ঘুমুই।"

শরৎকুমারী বলিল—"আমার অপরাধের কি ক্ষমা নেই? তুমি ক্ষমা না করলে, আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।"

হীরালাল অনেকক্ষণ শরৎকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি সেই শরৎকুমারী? হীরালাল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাহার বিপক্ষে যেন ভয়ঙ্কর কি একটা ষড়যন্ত্র হইতেছে, মনে মনে হীরালাল এইরূপ স্থির করিলেন। সুতরাং হীরালাল অস্থির হইয়া পড়িলেন। একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শনিবারের পর দিনই রবিবার। রবিবারে আফিসাদি বন্ধ থাকে, সেই জন্যই শনিবারের এত আদর। আজ রবিবার প্রাতঃকাল হইতেই হীরালাল বাবুর বৈঠকখানায় বিলক্ষণ ধুমধাম। এখন হীরালালের অনেক নূতন বন্ধু জুটিয়াছে, তবে সে সকল বন্ধু পরেশনাথ শ্রেণীর অন্তর্গত। হীরালালের এখন আর লোকলজ্জার ভয় নাই; আজ প্রাতঃকাল হইতে আমোদের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সে আমোদের জোড়ে প্রতিবাসিগণ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বৈঠকখানায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর যেরূপ পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইয়া থাকে, আজ দিবাভাগেই তাহার মাত্রা কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। তবে সে সকল পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনেতা হীরালাল স্বয়ং নহে, পরেশনাথপ্রমুখ বন্ধুগণই সে অভিনয়ের ভার লইয়াছিল। তবে হীরালালেরও ইহাতে যথেষ্ট আনন্দ ও উৎসাহ ছিল, সুতরাং সে অভিনয়ে কোনরূপ বাধা বা বিঘ্ন উপস্থিত হইত না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হীরালালের পূর্ব্বপুরুষগণের কলিকাতায় বহুকালের বাস; সুতরাং সে পাড়ায় হীরালাল বাবুর প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। পাড়ার সকলেই তাঁহার মঙ্গলা-

কাঙ্ক্ষী; সুতরাং হীরালালের এরূপ অভাবনীয় অধঃপতনে তাহারা সকলেই মর্ম্মাহত। তবে সাহস করিয়া কেহ কোন কথা হীরালালকে বলিত না, তাঁহার ব্যবহার দেখিয়াই তাহারা স্তম্ভিত! ভাল যদি মন্দ হয়, তবে তাহার দুর্নামের আর সীমা থাকে না। হীরালালের প্রতিবাসী, আত্মীয়, বন্ধু সকলেরই নিকট তাহার ভয়ঙ্কর দুর্নাম রটিয়াছিল; অনেক সময় হীরালালের এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের আন্দোলন তাঁহাদের মধ্যে হইত। অনেকে তাঁহার পূর্ব্বচরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার জন্য নীরবে অশ্রু মোচন করিত।

সুরার কি অপার মহিমা! পূর্ব্বে যে হীরালালের নাম শুনিলে লোকের আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিত, এখন সেই হীরালালের নামে সকলেই ঘৃণার সহিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। সুরার অসাধ্য কার্য্য এ পৃথিবীতে আর কি আছে? কিন্তু যে সুরা সোণার হীরালালকে মাটি করিয়াছে, তাহার আর অন্য ক্ষমতার পরিচয়ের আবশ্যক নাই। এ পৃথিবীতে এমন পাপ নাই, এই সুরা যাহার জন্ম দিতে পারে না; কিন্তু যে সুরা হীরালালের ন্যায় নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ঘোরতর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিতে পারে, সে সুরা পারে না—এমন কাজই বাকি আছে? সুতরাং ইহার অতুল ক্ষমতার আর কি পরিচয় দিব? ইহাকে মহাপরাক্রমশালী জানিয়া স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত ইহার পৃষ্ঠপোষক। যে সংসারে সুরা একবার প্রবেশ করে, সে সংসার অল্পদিনের মধ্যেই শ্মশানে পরিণত হয়। যে দিক দিয়া একবার চলিয়া যায়, সেই দিকেই হাহাকার সতীর দীর্ঘনিশ্বাস, বিধবার চক্ষের জল, বালকবালিকার ক্রন্দন—

এ সকলই তাহার অঙ্গের আভরণ। এই বিষ কোন্ বিধাতার সৃষ্টি?

আজ দিবা দুই প্রহর পর্যন্ত হীরালালের বৈঠকখানায় সেই পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় চলিয়াছে। এখনও হীরালালের স্নানাহার পর্যন্ত হয় নাই। আজ যে তাহার স্নানাহার হইবে, সে আশাও নাই। এমন সময় তাঁহার বন্ধু সুরেশচন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালাল সুরেশকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। বন্ধুকে কোনরূপ অভ্যর্থনা পর্য্যন্ত করিলেন না। সুরেশ বাবু সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য না করিয়া, ধীরে ধীরে হীরালালের নিকটে গিয়া বসিলেন। তাঁহার উপস্থিত বন্ধুগণের আমোদে বড় ব্যাঘাত পড়িল। হীরালাল ইঙ্গিতের দ্বারা তাহাদের সকলকে গৃহে যাইতে বলিলেন। তাহার সকলেই বিষণ্নমনে গৃহে চলিয়া গেল, কেবল পরেশনাথ গেল না। সে সময় হঠাৎ সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার অবস্থাও তাহার নয়। তাহারা চলিয়া গেলে পর, সুরেশ বাবু বলিলেন—"এখন পর্য্যন্ত স্নানাহার হয়-নি নাকি?"

হীরালাল উত্তর করিলেন—"না। বেলা কত বেজেছে?"

সুরেশ।—বেলা প্রায় একটা বাজে।

হীরালাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সে কি? এরই মধ্যে একটা বাজে!"

সুরেশ।—ভায়া, সময় ত তোমার হাত ধরা নয়। আর তুমি যে আমোদে ছিলে, এতে কটা বেজেছে, তা কি করে টের পাবে?

হীরালালের মুখে আর কথা নাই। হীরালাল নীরবে বসিয়া

রহিলেন। সুরেশ তখন পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"এত বেলা বেলা পর্য্যন্ত স্নানাহার না করে, কেবল মদ খাওয়া হচ্ছে বুঝি? এ রকম করলে ক'দিন বাঁচবে?"

হীরালাল এইবার গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"আমার মরণই ভাল। যখন দিবারাত্রি মনের অসুখে রয়েছি, তখন বেঁচে থেকে আর সুখ কি দাদা?

সুরেশ। দিবারাত্র মনের অসুখটা কিসে হয়?

হীরালাল।—কেন তুমি কি তার কারণ জান না?

সুরেশ। জানি—তোমার স্ত্রী তোমার মনের মতন নয়। এ সংসারে ক'জনের স্ত্রী মনের মত হয়? তা বলে এমন করে, নিজে অধঃপাতে কে যায়?

হীরালাল। মন ভাল থাকবে বলেই যাই।

সুরেশ। আমি জানতুম, তুমি ভালরূপ লেখাপড়া শিখেছ। তোমার ভালরূপ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। এখন দেখছি—তুমি একটি নিরেট মূর্খ। মদ খেয়ে খানিকক্ষণ 'হো-হো' করলেই বুঝি মন ভাল থাকে? শরীরের সঙ্গে আর মনের সঙ্গে যে কি নিকট সম্বন্ধ তা কি তুমি জান না? যাতে শরীর নষ্ট হয়, তাতে কি কখন মন ভাল থাকতে পারে?

হীরালাল এইবার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"ভাই সুরেশ, আমার মনের কথা তোমায় সব খুলে বলেছি। আমি আমোদ করবো বলে, মদ খাই না; আমি আমার জীবনকে নষ্ট করবার জন্যেই এখন মদ খাই। একদিন হঠাৎ বিষ খেয়ে মরার চেয়ে, এ মজার বিষে ক্রমে ক্রমে এই রকমে মরা কি ভাল নয়?

সুরেশচন্দ্রও এবার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"তোমার

মরাই ভাল—এরূপ ঘৃণিত জীবন রাখার চেয়ে এখন মরাই ভাল! আর তোমার মৃত্যুত এক প্রকার হয়েই গেছে। আমাদের সেই প্রাণের বন্ধু হীরালালত এখন আর নাই। সে ত অনেক দিন মরে গেছে! এখন তার সেই মৃতদেহে এক কুলাঙ্গার প্রবেশ করে, এই সকল কেলেঙ্কারী করছে বইত নয়।"

হীরালাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"মরবো—আর দিন কতক পরে মরবো। যে আমার জীবনের সকল সুখ, সকল আশা-ভরসা নষ্ট করেছে, তার জীবনের সকল সুখ সকল আশা-ভরসা নষ্ট করে, তবে মরবো। প্রাণে আমি যে জ্বালা পেয়েছি, দিবারাত্রি সে জ্বালা ভোগ করছি, সে জ্বালা যখন সে অনুভব করবে দেখতে পাবো, আমি সেই দিনই মরবো।"

সুরেশ বাবু তখন বিরক্তভাবে বলিলেন—"তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি এখন সব লোপ পেয়ে গেছে। এ তোমার চোরের উপর রাগ করে ভূঁয়ে ভাত খাওয়া হচ্ছে। তুমি তোমার স্ত্রীর উপর রাগ করে, তোমার নির্ম্মল চরিত্র হারাচ্ছ; কিছুতেই তোমার এ ক্ষতির পূরণ আর হবে না। নির্ম্মল চরিত্র অপেক্ষা মানুষের মূল্যবান্ সম্পত্তি এপৃথিবীতে আর কিছুই নাই।"

হীরালাল। আমি সব বুঝি—সব জানি। কিন্তু আমার প্রাণের জ্বালা কেউ বুঝতে পারে না—এই আমার দুঃখ। আমি যে অধঃপাতে যাচ্ছি, তাকি আমি বুঝতে পারি না? কিন্তু এই অধঃপাতে যাওয়া ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় কিছুই নাই। এরূপ মনের কষ্টে অনেকত পাগল হয়, মনে কর ভাই, আমি পাগলই হয়েছি

সুরেশ। তুমিত একলা অধঃপাতে যাচ্ছ না; সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও অনিষ্ট কর্‌ছো যে। আমি শুন্‌তে পাই, তোমার নাকি অনেক দেনা দাঁড়িয়েছে। তোমার দেনা হবারত কোন কারণ নাই। তুমি আপিসে প্রতিমাসে দেড়শত টাকা বেতন পাও, তা ছাড়া তোমার পৈতৃক সম্পত্তির আয়ও যথেষ্ট আছে। তোমার দেনা হয় কেন—আমায় বুঝিয়ে দিতে পার? এখন যেরূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে তোমার আপিসের চাকুরীত থাকা অসম্ভব; আর দেনাও যা দাঁড়িয়েছে, তাতে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করাও দুষ্কর। তুমি যদি ইচ্ছে করেই তোমার জীবন নষ্ট কর, তা'হলে তোমার বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, আর বিধবা ভগিনীর কি উপায় হবে বল দেখি?

হীরালাল এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু পরেশনাথ উত্তর করিল—"যার অদেষ্টে যা আছে বাবা, তাই হবে। সে ভাবনা, এখন ভাববার দরকার কি? এখন যে কয়দিন এ পৃথিবীতে থাক্‌তে হবে, আমোদ করে কাটিয়ে দিতে পার্‌লেই হলো বাবা।"

সুরাপানে উন্মত্ত পরেশনাথের মুখে জড়ান অস্পষ্ট ঐ কথা কয়েকটি শুনিয়া সুরেশ বাবু ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—"আমি তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি না। তোমাদের মত কতক গুলো নরাধম জুটেইত এই সোণার হীরালালকে মাটি কর্‌ছো।"

তাহার পর তিনি হীরালালকে বলিলেন—"এখন এ সকল কথার সময় নয়, আগে তুমি স্নানাহার কর, তার পর এ সকল কথা হবে। কিন্তু সে স্থানে আর কেউ থাক্‌তে পার্‌বে না; কেবল তুমি আর আমি থাক্‌বো।"

হীরালাল এতক্ষণের পর উত্তর করিলেন—"আমি স্নানাহার আজ আর করবো না। আমায় তুমি সে অনুরোধ আর করো না। আমি যে অধঃপাতে গিয়েছি, তা কি আমি বুঝতে পারছি না? আমি সবই বুঝতে পারছি। তুমি আমায় ভৎর্সনা কর, গালি দাও, জুতো মার, লাথি মার—আমি অম্লানবদনে সব সহ্য করবো। আমি জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম, ভগিনীর ভক্তি, তোমার ন্যায় বন্ধুর ভালবাসা—সব ত্যাগ করেছি। এ পৃথিবীতে আমার আর সুখ নাই—সুখের আশাও নাই। আমি আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সকলেরই ঘৃণার পাত্র, তোমরা সকলে আমায় ঘৃণা করো।"

সুরেশচন্দ্র তখন রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"তোমার যে এতদূর অধঃপতন হবে, তা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। আমি তোমায় একলা কিছুক্ষণের জন্য চাই।"

পরেশনাথ তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বোতলের অবশিষ্ট সুরা গেলাসে ঢালিয়া সুরেশের সম্মুখেই পান করিল। তাহার পর টলিতে টলিতে আর অস্পষ্ট ভাষায় কি বকিতে বকিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। সুরেশচন্দ্র অবাক্ হইয়া সাশ্রুনয়নে তাহার ব্যবহার দেখিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল বাবুর বৈঠকখানা হইতে টলিতে টলিতে পরেশনাথ নিজের বাসার দিকে চলিল। তাহার বাসায় প্রবেশের পূর্ব্বেই দ্বারের কপাটে সজোরে পদাঘাতের একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। সেই শব্দে সুখদার প্রাণ একবারে উড়িয়া গেল। সুখদা তখন রন্ধনশালায় পিতার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। কপাটের সেই ভয়ঙ্কর শব্দে পিতা কিরূপ অবস্থায় আসিতেছেন, তাহা বুঝিতে সে বালিকার বাকি রহিল না। বালিকার প্রাণের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল; ভয়ে বালিকা তখন মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। এই সময় সেই উন্মত্ত পরেশনাথ বিকৃতকণ্ঠে ডাকিল—"সুখ!"

সুখদা কোন উত্তর দিবে কি—ভয়েতেই তখন তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। পরেশনাথ উন্মত্তভাবে পুনরায় ডাকিল—"সুখি!"

যাহার ন্যায় অসুখী, বোধ হয়, এ পৃথিবীতে নাই, জন্মাবধি যে কখন সুখের আস্বাদ পায় নাই, যাহার সকল সুখের কণ্টক তাহার জন্মদাতা পিতা, সেই নরাধম পিতাই এখন কন্যাকে ডাকিতেছে—"সুখি!"

সুখদার কোন উত্তর না পাইয়া পরেশনাথ ক্রোধে অন্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে রন্ধনশালার দিকে আসিতে লাগিল।

সে গর্জ্জন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সুখদার চৈতন্য হইল, সুখদা প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিবার জন্য রান্নাঘরের দরজার দিকে দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখিল—তাহারই পিতারূপী কালান্তক যম ছুইহাত্তে দরজা আটকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!

সুখদা আর কি করিবে? সেই গৃহের মধ্যেই দৌড়িল, কিন্তু সে গৃহের মধ্যে দৌড়িয়া আর কোথায় যাইবে? তাহার পশ্চাতে টলিতে টলিতে সেই নরাধম পিতা আসিতেছে। সুখদা অগত্যা সেই ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আর সেই নরাধম পিতা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই প্রাণভয়ে ভীতা বালিকা-কন্যার উপর লাফাইয়া পড়িল! বালিকার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে উন্মত্ত পরেশনাথ তাহাকে গৃহের বাহিরে আনিল।

গৃহের বাহিরে আনিয়াই প্রহার! সে প্রহার সহজ প্রহার নহে—সুরা ও ক্রোধে উন্মত্ত পশুর নির্দ্দয় প্রহার! দয়া নাই —মায়া নাই—খুনের ভয় ও নাই—এমন নৃশংস পিতার হস্তের প্রহার! বালিকার করুণ আর্ত্তনাদে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল, তত্রাচ সে প্রহারের বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—অবিশ্রান্ত প্রহার! সে প্রহারে বালিকা নির্জীব হইয়া মৃতপ্রায় প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিল। তখন পরেশনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং উন্মত্তভাবে সেইখানে বেড়াইতে লাগিল। তখনও কি সে নরাধম প্রহারে বিরত ছিল? সুখদা ক্রন্দন করিলেই পরেশনাথ দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রহার আরম্ভ করে। প্রহারে কি কখন ক্রন্দন নিবারণ হয়? এ দিকে কিন্তু ক্রন্দনের মাত্রা বৃদ্ধি হইলেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই

প্রহারের মাত্রাও বৃদ্ধি হইতে থাকে। সুখদা কাতরকণ্ঠে বলিতেছিল—"বাবা! আর আমায় মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি আর আমায় মেরো না। এবার মেলে আমি মরে যাব। না হয়, একবারে মেরে ফেলো। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, এমন করে না মেরে, আমায় একবারে মেরে ফেলো!"

কি হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ! কিন্তু বালিকার সেই ক্ষীণ কোমলকণ্ঠবিনিসৃত করুণবিলাপ ধ্বনিতে কর্ণপাত করিবে কে? নরক—কে বলে তোমার জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে? এই পরেশনাথই মূর্ত্তিমান নরক! আর স্বর্গ, এ পাপময় পৃথিবীতে কি তোমার কোন চিহ্নই নাই? এ বালিকার আর্ত্তনাদ কি কাহারও কর্ণে গিয়া পৌঁছিল না? সে মর্ম্মভেদী ক্ষীণস্বর অন্য কাহার নিকট না পৌঁছিলেও যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—অগতির গতি—অনাথের বন্ধু—সেই অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী ভগবানের কর্ণে গিয়াও পৌঁছিল না কি? ঐ দেখ একজন স্ত্রীলোক মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে বালিকার উদ্ধারের জন্য বিদ্যুৎবেগে দৌড়িয়া আসিতেছে! ভয় নাই—লজ্জা নাই—হৃদয়ের আবেগে যেন এক আকারূপিণী উন্মাদিনী মূর্ত্তি!

পরেশনাথ এবার পশ্চাতে ফিরিবামাত্র, সেই মূর্ত্তি নিমেষের মধ্যে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া বিদ্যুৎবেগে সে স্থান হইতে দৌড়িয়া গেল! পরমুহূর্ত্তেই পরেশনাথ ফিরিয়া দেখিল—সুখদা আর সে স্থানে নাই! ক্রোড়স্থিত অভুক্ত শিকার হঠাৎ অদৃশ্য হইলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেরূপ হুঙ্কার করিয়া উঠে, পরেশনাথ সেইরূপ একটা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিয়া উঠিল!

সেই মূর্ত্তিমতী দয়া কে?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার কে—সেই পরদুঃখকাতরা অমলা। অমলা আজ প্রাতে জননীর অজ্ঞাতে চুপি চুপি সুখদার নিকট আসিয়া তাহার সাংসারিক কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিল; তাহার পর রন্ধনাদির উদ্যোগ পর্য্যন্ত করিয়া দিয়া সুখদার সেই শিশু ভ্রাতাটীকে আপনার শয্যায় ঘুম পাড়াইয়া রাখিল। অমলার মাতা কন্যার এরূপ ব্যবহার ভাল বাসিতেন না। সেই কারণ অমলা সদা শঙ্কিতভাবে—জননীকে গোপন করিয়া, এই সকল কার্য্য করিত। সে সময় যদি কেহ সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত, অমলা অমনি সে কাজ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া যেন সুখদার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেই তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে, এইরূপ ভাণ করিত। সর্ব্বেশনাথের স্বভাব চরিত্র অতি জঘন্য, এবং সে অমলার স্বজাতীয়ও নহে; এদিকে অমলা আবার ব্রাহ্মণের ঘরের বাল-বিধবা। এই সকল কারণে অমলার জননী অমলাকে সুখদার নিকট যাইতে সর্ব্বদাই নিষেধ করিতেন। অমলা কিন্তু জননীর সে আজ্ঞা পালন করিতে পারিত না; সুখদা আর তাহার সেই শিশু ভ্রাতাটির জন্য সর্ব্বদাই তাহার প্রাণ কাঁদিত। তবে অমলা বড় বুদ্ধিমতী, এরূপ সময় সুখদার নিকট যাইত, যে

সময় পরেশনাথ বাড়ীতে থাকিত না। হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলে অমলা এরূপ কৌশলে সে স্থান হইতে পলায়ন করিত যে, পরেশনাথ তাহাকে কখনই দেখিতে পাইত না।

আজ যখন পরেশনাথ সুখদাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছিল, তখন অমলা তাহার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া, গোপনে পরেশনাথের সেই শিশুপুত্রটিকে দুগ্ধপান করাইতেছিল। সেই কারণ প্রথমে সুখদার আর্ত্তনাদ অমলার কর্ণে গিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু এই সময় অমলা প্রাণের ভিতর কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। সুতরাং সেই শিশুটিকে পুনরায় শয্যায় শয়ন করাইল, এবং গৃহের দরজা খুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। তখন সুখদার আর্ত্তনাদ অমলার কর্ণে গিয়া পৌছিল। অমলা কি আর স্থির থাকিতে পারে? জননীর ভয়—পরেশনাথের ভয়—সকল ভয় বিস্মৃত হইয়া বালিকার উদ্ধারের জন্য দৌড়িল।

বালিকাকে সেই নির্দ্দয় পিতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া অমলা তাহাকেও আপনার গৃহে আনিল। সুখদা তখন এক প্রকার জ্ঞানশূন্যা—মৃতপ্রায়! অমলা প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। প্রথমে চক্ষে ও মুখে জল দিয়া তাহাকে কতকটা প্রকৃতিস্থ করিল। অমলাকে দেখিয়াই সুখদার যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইয়াছিল, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি তখনও ছিল না। সুখদার নিশ্বাসের টান এখনও বড় প্রবল, থাকিয়া থাকিয়া সে দীর্ঘ নিশ্বাসও যেন আটকাইয়া যাইতেছিল। অমলা তাড়াতাড়ি গরম দুগ্ধ আনিয়া ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে সুখদাকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। এইরূপ শুশ্রূষায়

সুখদা একটু বল পাইয়া বলিল—"মা, তুমি আমায় কেন বাঁচালে ? আমি মলেই বেঁচে যেতুম।"

বলিতে বলিতে বালিকার অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রু-ধারা ছুটিল। বালিকা এখন অমলাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করে। বালিকার মা-বলা-সাধ এখনও মেটে নাই, তাই অমলা হইয়াছে তাহার মা। সে 'মা' সম্বোধনে সেই বাল-বিধবা অমলার হৃদয়নিহিত মাতৃস্নেহ কোথা হইতে আসিয়া সে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল—যেন মরুভূমে কল্লোলিনী প্রবাহিত হইল। কিন্তু তাহার পর-মুহূর্ত্তেই সুখদার মর্ম্মান্তিক কথায় অমলার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সেই অশ্রুপ্লাবিত শুষ্কমুখ দেখিয়া অমলাও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোর মতন ছোট মেয়ে এত কষ্ট সহ্য ক'রে ক'দিন বাঁচবে ? এ বয়সে এত কষ্ট কেউ কি সহ্য করতে পারে ? তার উপর আবার প্রহার! সুখদা, তোর কথা মনে হলে আমার প্রাণ ফেটে যায়। বিধাতা—"

অমলা আর বলিতে পারিল না। তখন তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। অমলাকে কাঁদিতে দেখিয়া সুখদা আর কাঁদিল না। অমলা যখন সুখদাকে এতদূর ভালবাসে, তখন সুখদা কি অমলাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে ? পিতার প্রহার ও গর্জ্জনে সুখদা ক্রন্দন বন্ধ করিতে পারে নাই, কিন্তু যখন সেই ক্রন্দনে তাহার স্নেহময়ী জননীস্বরূপা অমলাকে কাঁদিতে দেখিল, তখন সুখদা কি আর কাঁদিতে পারে ?

সুখদা আর কাঁদিল না। সুখদাকে একটু সুস্থির হইতে দেখিয়া, এই সময় অমলার হঠাৎ একটা কথা স্মরণ হইল।

অমলা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"সুখদা, তোমার খাওয়া হয়েছে?"

সুখদা সে প্রশ্নের কোন উত্তর করিল না। অমলা তখন আর সে স্থানে রহিল না, তৎক্ষণাৎ সে গৃহ হইতে কোথায় চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই অমলা অন্নব্যঞ্জন হস্তে সেই গৃহের মধ্যে আসিল। কিন্তু তখন সুখদার উঠিবার শক্তি ছিল না। অমলা স্বহস্তে তাহাকে ধীরে ধীরে আহার করাইতে আরম্ভ করিল। এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ করিল—আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা সেই ঝি।

ঝি সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পর আরম্ভ করিল—"ও মা কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! আমি যাব কোথা! জাতধর্ম্ম কি নেই? বামুনের ঘরের বিধবা হয়ে, নিজে হাতে করে কায়েতের মেয়েকে ভাত খাওয়াচ্ছে গা! হাঁগা, তুমি কি খিরিষ্টান্ নাকি? বলি ঘরে বসে, এম্‌নি করে কি জাতধর্ম্মের মাথা খেতে হয়?"

ঝিকে দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া অমলা একটু অপ্রস্তুত হইল। অমলা জাতিভেদ মানিত, কিন্তু এরূপ অবস্থায় তাহার সে সকল কথা মনে উদয় হইত না। অমলা আগ্রহের সহিত মিনতি করিয়া ঝিকে বলিল—"ঝি, তুই চুপ কর্, এখনি না শুন্‌তে পেলে আমায় বড় বক্‌বেন। এরূপ বিপদের সময় সে কথা কি মনে থাকে বাছা?"

ঝিকে যখন চুপ করিতে বলা হইয়াছে, তখন সে ঝি কি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ঝি এইবার উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"তা মাঠাকুরুণ শুনতে পাবে বলে, চখের ওপর দেখে, এ সকল

কি সহ্য করা যায়? ওমা! যাদের এহ্‌কাল-পরকালের ভয় নেই, এমন বাকুলে আবার চাক্‌রী কর্‌তে আছে?"

অমলা তখন পুনরায় মিনতি করিয়া বলিল—"ওঝি, তোর পায়ে পড়ি, তুই একটু চুপ কর্। আমি এই কটি ভাত খাইয়ে দিয়ে স্নান করে আস্‌বো।"

ঝি এইবার রাগিয়া বলিল—"কি! বামুনের মেয়ে হয়ে, আমার পায়ে পড়া!"

তাহার পর ঝি ক্রন্দনের সুরে আরম্ভ করিল—"আমাকে অধঃপাতে দেবার লেগে, সবাই আমার পায়ে পড়্‌তে আসে। আমি এমন বাকুলে আর থাক্‌বো-নি। এদের ধর্ম্মকর্ম্ম নেই। পত্তোর খাটিয়ে খেতে এসেছি বলে, কি আমি জাতধর্ম্ম খোয়াব?"

অমলা ঝিকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইল; কিন্তু কিছুতেই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। অমলার সান্ত্বনাবাক্যে ঝির ধর্ম্মভয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন সময় স্বয়ং সাবিত্রী ঠাকুরাণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঝির এইরূপ ব্যবহারে সুখদাকে আহার করান তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঝিকে সান্ত্বনা করিতেই অমলা তখন ব্যস্ত সুতরাং সুখদাকে আর আহার করাইবে কিরূপে? সাবিত্রী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কন্যাকে তদবস্থায় দেখিলেন। ভয়ে অমলা জড়সড় হইয়া গেল। কিন্তু সাবিত্রী একটীও কথা বলিলেন না। সাবিত্রীর মন আজ বড়ই অস্থির। পুত্রের ব্যবহারে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া আছেন; সুতরাং অন্য কোন

দিকে আজ আর তাঁহার লক্ষ ছিল না। তিনি এতক্ষণ আপনার শয়নকক্ষে মনের দুঃখে পড়িয়া ছিলেন। এখনও তাঁহার স্নানাহার হয় নাই।

সাবিত্রী কিন্তু কন্যার মুখখানি শুষ্ক দেখিয়া বলিলেন—"অমলা ভাত খেয়েছিস্ মা?"

অমলা তখন সাহস করিয়া বলিল—"না মা, আজ সুখদাকে তার বাবা মেরে খুন করে ফেলেছে; বাড়ীর মধ্যে একটা খুন হয় দেখে কি করে খাবো মা?"

সাবিত্রী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"হা আমার অদেষ্ট! আমার ছেলেমেয়ে দুই সমান হলো তবে আর কি সুখে এসংসারে থাক্‌বো? আমার যা কিছু আছে, বেচে কিনে আমি কাশী চলে যাব। এত বেলা হয়েছে, এখনও যদি নিজে না খেয়ে ছত্রিশ জেতের শক্‌ড়ী ছুঁয়ে বেড়াবি, তবে আর বাঁচ্‌বি কি করে?"

সুখদার আহার তখন শেষ হইয়াছিল; সুতরাং অমলা আর একটিও কথা না বলিয়া নীরবে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হীরালালের অধঃপতন এইবার চরম সীমায় উঠিয়াছে এখন দিবারাত্র হীরালাল সুরাপানে উন্মত্ত থাকে। আফিসের সাহেবেরা পর্য্যন্ত হীরালালের উপর বিরক্ত হইয়াছেন। প্রতি সোমবারেই হীরালালের আফিস কামাই হয়। আর বুঝি তাহার চাকুরীটুকুও থাকে না। এদিকে চারিদিকে দেনার জ্বালায় হীরালাল ব্যতিব্যস্ত। অনেক সময়ে তাহার মন এই কারণে বড় অস্থির থাকে। সে অস্থির মন সুস্থ করিবার আবার ঔষধ সেই সুরা। হীরালালের এখন দৃঢ় বিশ্বাস এ রোগের ইহা ব্যতীত আর অন্য ঔষধ নাই!

আপিসে হীরালালের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। সাহেবেরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত এবং বিশ্বাসও করিত। কিন্তু এখন আর হীরালালের উপর সাহেবদিগের সে বিশ্বাস নাই এবং তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণও তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান করিত না। হীরালাল এই সকল বিষয় বুঝিয়াও বুঝিতেন না এখন কি আর সে হীরালাল আছে?

এক দিন হীরালাল আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছেন,

এমন সময় আফিসের বড় সাহেব হীরালালকে ডাকিয়া পাঠাই-লেন। আজ বড় সাহেবের গৃহে যাইবার সময় কি জানি কেন—হীরালালের প্রাণের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। অন্য দিন সে গৃহে যাইতে, হীরালালের প্রাণে এত ভয় কখন হইত না। হীরালাল সাহেবের সম্মুখে গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন; সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সুতার হিসাব সমস্ত ঠিক আছে?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া হীরালালের মাথায় হঠাৎ যেন বজ্রাঘাত হইল; কিন্তু তিনি সে সময় সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—"হাঁ মহাশয়, সমস্তই ঠিক আছে।"

বড় সাহেব তখন আজ্ঞা করিলেন—"তোমার সমস্ত হিসাব এই দুই ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দাও।"

হীরালাল বিষণ্নমনে সেই দুই ব্যক্তির দিকে চাহিলেন। তাঁহারা দুই জনেই অপরিচিত ইংরাজ; সুতরাং হীরালাল বিস্মিত হইয়া কেবল তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! হঠাৎ কেন এইরূপ তাঁহার প্রভুর আজ্ঞা হইল, তিনি তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এইবার বড় সাহেব যাহা বলি-লেন, তাহার মর্ম্ম এই—"ইহাঁরা সরকারী হিসাব-পরিদর্শক, আমাদের সুতার হিসাবে অনেক টাকা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে, ইহাঁদিগকে আনিয়াছি; তুমি সমস্ত হিসাব ও তহবিল ইহাঁদিগকে বুঝাইয়া দিবে।"

হীরালালের মাথায় এইবার যথার্থই বজ্রাঘাত হইল। হীরা-লাল চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তবে হীরালালের মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে! তাহা না হইলে হিসাব দিবার নাম

শুনিয়াই হীরালালের মুখ এত বিষণ্ণ হইবে কেন? সে দিন কতক বুঝাইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু এক দিনে আর সমস্ত হিসাব বুঝান হইতে পারে না। হীরালাল সে দিনকার মতন নিস্তার পাইলেন, এবং পর দিন শরীর অসুস্থ ভাণ করিয়া আর আফিসে গেলেন না। সাহেবদিগের ভয়ানক সন্দেহ হইল, সন্দেহ কেন—হীরালালের স্বতার হিসাবে যে বলক্ষণ গোলযোগ আছে, এই ঘটনায় তাহা সাহেবদের মনে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস হইয়া গেল। হীরালালকে দেখিতে বড় সাহেব নিজে তাহার বাড়ীতে গেলেন; হীরালাল কিন্তু বড় সাহেবের সহিত দেখা করিতে সাহস করিল না। তখন সাহেব ক্রোধে অন্ধ হইয়া হীরালালের নামে পুলিশ আদালতে নালিশ করিলেন। সেই দিনই তাহাকে গেরেপ্তারের জন্য এক ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় পুলিশের লোকে হঠাৎ হীরালালের বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিল; হীরালাল তখন অন্তঃপুরের মধ্যেই ছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া অন্দরের পশ্চাৎদিকের অন্য এক প্রতিবাসীর ছাদে লাফাইয়া পড়িয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সেইদিন হইতে হীরালাল গৃহত্যাগী হইলেন। আজ এখানে, কাল সেখানে—এইরূপে তাহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এরূপে জীবন যাপন করা হীরালালের পক্ষে বড়ই কষ্টকর; সুতরাং হীরালাল আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কি উপায়ে আত্মহত্যা করিবেন, তাহা স্থির করিতে হীরালালের দুই দিবস কাটিয়া গেল। শেষে বিষপানে জীবন নষ্ট করাই স্থির হইল। বিষ সংগ্রহ পর্য্যন্ত করা হইল। হীরালাল সে দিন এক আত্মীয়ের গৃহে লুক্কায়িত ছিলেন। রাত্রি দুই প্রহর

অতীত হইয়া গিয়াছে। সে বাড়ীর সকলে এখন নিদ্রিত, কেবল হীরালালের চক্ষে নিদ্রা নাই। আজ অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা একে একে হীরালালের মনে পড়িতে লাগিল। বন্ধু সুরেশ চন্দ্রের কথাও এই সময় তাহার মনে উদয় হইল। সুরেশচন্দ্রের সেই তিরস্কার—"তোমার মরাই ভাল—এরূপ ঘৃণিত জীবন রাখার চেয়ে, এখন মরাই ভাল"—এখনও যেন হীরালালের কর্ণে বাজিতেছিল। হীরালালের সকলই গিয়াছে। মান, সম্ভ্রম, যশ, খ্যাতি, চরিত্র—সকলই গিয়াছে, তবে কি সুখে তিনি আর এ পাপময় জীবন রাখিবেন? শেষে কারাগারে জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা এ পাপের বোঝা নামানই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হীরালালের কলঙ্কের আর বাকি কি? হীরালাল একটী ক্ষুদ্র গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া এই সকল কথা ভাবিতেছিলেন। আর না—আর চিন্তার সময় নাই; হীরালালের হস্তে বিষপাত্র! কিন্তু হীরালালের সে হস্ত এখন কাঁপিতেছে কেন? ঐ বিষপাত্র মুখে তুলিয়া দিতে সে হস্তের কি ক্ষমতা নাই? আবার এ কি! হীরালালের চক্ষে জল কেন? হীরালাল কাঁদিলেন,সেই বিষপাত্র হস্তে করিয়াই কাঁদিলেন। আত্ম-হত্যা করিতে যে সাহসের আবশ্যক, হীরালালের সে সাহস নাই। এই সময় তাঁহার সেই স্নেহময়ী জননীর কথা মনে উদয় হইল; আর সেই মূর্তিমতী সরলতা, সেই ভ্রাতৃগতপ্রাণা ভক্তি-প্রস্রবণ, সেই পরদুঃখকাতরা দয়ার প্রতিমা অমলাকে কি হীরালাল ভুলিতে পারিয়াছিলেন? তাহার পর সেই অকপট বন্ধু সুরেশ-চন্দ্রের কথাই বা হীরালাল কিরূপে ভুলিবেন? হীরালালের আর আত্মহত্যা করা হইল না, হীরালাল বিষের পাত্র দূরে নিক্ষেপ

করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে হীরালাল চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দয়াময়, রক্ষা কর—এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর।"

তখন অনুতাপানলে হীরালালের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, আর হীরালাল কাতরকণ্ঠে একাগ্রচিত্তে কেবল ডাকিতে লাগিলেন—"দয়াময়, রক্ষা কর।"

সেই করুণানিদান অসীম দয়ালু ভগবানের নিকট হীরা-লালের ঐ ক্ষীণকণ্ঠস্বর কি পৌঁছিবে না? যিনি অনন্ত ক্ষমাগুণে কোটী কোটী পাপীর প্রতিদিন আহার যোগাইয়া থাকেন, তিনি কি হীরালালের পাপ ক্ষমা করিবেন না?

এমন সময় কে বাহিরের দরজা ঠেলিয়া চুপি চুপি ডাকিল—"হীরালাল, দরজাটা খুলে দাও।"

সেই গভীর রাত্রে—সেই চিরপরিচিত স্বর শুনিয়া, হীরালাল শিহরিয়া উঠিলেন! তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দরজা খুলিয়া সম্মুখে দেখিলেন—সুরেশচন্দ্র।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুরেশচন্দ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। সুরেশকে দেখিয়া হীরালাল আর কোন কথা বলিলেন না, কেবল কাঁদিলেন—অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। সুরেশও কাঁদিলেন, তবে সে ক্রন্দন যতদূর পারিলেন, আত্মসংযম করিয়া কাঁদিলেন। উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলে, প্রথমে সুরেশ আরম্ভ করিলেন—"আমি আজ ৪।০ দিন ধরে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, আজ অনেক কষ্টে তোমার দেখা পেয়েছি। আমি তোমার আফিসের লোক বলে, তুমি কোথায় থাক, আমাকেও কেউ বিশ্বাস করে বলে দেয় না। তুমি কি স্থির করেছ? এরূপ লুকিয়ে লুকিয়ে আর কত দিন কাটাবে? সুতার হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি গিয়াছে—তুমি এত টাকা কি কর্‌লে?"

হীরালাল শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আমি এত টাকা কখনই চুরি করি নাই। আমার বোধ হয়, আট দশ হাজার টাকা নিয়ে থাক্‌বো। আর সে টাকা চুরি করবো বলেও ভাঙ্গি নাই বিশেষ আবশ্যক পড়েছিল বলেই, ছুপো পাঁশো করে নিয়েছিলুম; আবার সময় মত পরিশোধ কর্‌বার ইচ্ছা আমার ছিল,

তাহার চেষ্টাও আমি করছিলাম। এমন সময় এই ঘটনা ঘটলো।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"তুমি যে এত টাকা লও নাই, তা আমি জানি। তোমার বুদ্ধির দোষে এখন এ সমস্ত টাকা তোমার ঘাড়ে পড়ছে। তুমি নিজে ভাল হলে, আর এরূপ ঘটত না। তোমায় আমি অনেক বলেছি, এ সময় আর কোন কথা বলবো না। তোমায় নিশ্চয় জেলে যেতে হবে দেখ্‌ছি। এখন কি করবে স্থির করেছ বল?"

হীরালাল একটা বিষয় স্থির করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইত। হীরালাল তখন সতৃষ্ণনয়নে একবার সেই নিক্ষিপ্ত বিষপাত্রের দিকে চাহিলেন। এখনও সে পাত্র বিষে পূর্ণ ছিল; হীরালাল কিন্তু তখন মনে মনে স্থির করিলেন—ঐ পাত্রস্থিত বিষ এখন আর তাহার পক্ষে বিষ নহে, উহা এখন অমৃত! সুতরাং সুরেশচন্দ্রের সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিলেন না। সুরেশ বাবু পুনরায় বলিলেন— "তুমি এতদিন নিশ্চয় ধরা পড়তে, কেবল আমি গোলযোগ করে রেখেছি। আর পারি না—এখন কি করবে স্থির করেছ বল।"

হীরালাল মনে মনে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, সে বিষয় সুরেশচন্দ্রের নিকট গোপন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—"যা অদৃষ্টে আছে হবে। কিন্তু এ সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভাল হয়েছে। আমি আর এ কষ্ট সহ্য করতে পারি না; এ কষ্ট সহ্য করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। আমি আর গোপনে থাক্‌বো না, এখন তুমি আমার মা আর ভগিনীর তত্ত্বধানের ভার নিলে, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমার বড়ীঘর যা

কিছু আছে, তাও কিছুই থাক্‌বে না; কিন্তু অমলার যা কিছু আছে, তাতে তাহাদের কোন কষ্ট হবে না। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, আমি তোমার মতন বন্ধু পাব না। তোমার কথা শুন্‌লে আমার এ দশা হতো না। তুমি এ বিষয় স্বীকার হলে, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

সুরেশ বাবু হীরালালের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"তোমার স্ত্রীর কথা কিছু বলছ না যে।"

হীরালাল। তার বাপ ভাই আছে, কিন্তু এদের আর কেউ নাই!

এই কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে হীরালালের দুই চক্ষু পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হইল। সুরেশ বাবু তখন বলিলেন—"তাই হবে। কিন্তু এখন যথার্থ করে বল দেখি, তুমি আত্মহত্যার মতলব করেছ কি না?"

হীরালাল। সে মতলব করেছিলুম, কিন্তু সে সাহস আমার হলো না। পাপীর মৃত্যুভয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ঐ দেখ, বিষ এখনও পড়ে রয়েছে।

হীরালালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হঠাৎ এই কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। এই ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে বিষ হস্তগত করিয়া বলিলেন—"আর তোমায় যদি এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি?"

হীরালাল বিস্মিতনেত্রে সুরেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোন কথাই তখন বলিতে পারিলেন না। সুরেশ

চন্দ্র বলিলেন—"আমি এ যাত্রা তোমায় উদ্ধার করতে পারি, যদি তুমি সমস্ত কুসঙ্গ ত্যাগ করে, পুনরায় ভাল হবে প্রতিজ্ঞা কর।"

হীরালাল। আমি অনেক সময় তোমার কাছে আর মদ স্পর্শ করবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার প্রাণপণে চেষ্টাও করেছি, কিন্তু একবারও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি নাই। আমি অনেক প্রতিজ্ঞা করেছি—আর প্রতিজ্ঞা করবো না; কিন্তু এ বিপদ থেকে কি করে যে উদ্ধার পাবো, তাত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

সুরেশ। এই পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহেবেরা পেলেই, তারা তোমায় ছেড়ে দেবেন, আমি এ বিষয় ঠিক্ করেছি।

হীরালাল। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাব কোথায়? আমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করলেওত হবে না।

সুরেশ। আমি সে বিষয়ও স্থির করেছি; তবে কেবল তোমার সর্ব্বস্বতে হবে না, তোমার আত্মীয় বন্ধুর সর্ব্বস্বও এতে দিতে হবে।

হীরালাল। কি করে এত টাকার যোগাড় হবে, তাত আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

সুরেশ। আমি তারও ঠিক করেছি; তোমার বাড়ীর দর হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা।

হীরালাল। তারপর, আর আমার কি আছে?

সুরেশ। তোমার স্ত্রীর গহনা আর তোমার মায়ের হাতের নগদ টাকায় পাঁচ হাজার হবে।

হীরালাল। আমার স্ত্রী সে গহনা দেবে কেন?

সুরেশ। তুমি তোমার স্ত্রীকে যেরূপ ভাব, আর আমিও তোমার মুখে শুনে তাঁকে যেরূপ ভাবতুম, তিনি সেরূপ নন। আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি, সে সকল কথা তোমায় পরে বলবো।

হীরালাল। আচ্ছা, ত্রিশহাজার, তার পর?

সুরেশ। তোমার ভগিনীর গহনা, নগদ টাকা আর শ্বশুর প্রদত্ত কোম্পানীর কাগজে প্রায় পোনের হাজার টাকা হবে।

হীরালাল। অমলার যথাসর্ব্বস্ব আমি নেবো। যে হত ভাগিনী বিধবার যা কিছু আছে, আমি তা কি করে নেবো?

সুরেশ। হীরালাল, তোমার মতন সৌভাগ্যবান আমিত কাকেও দেখিনি। আমি এত দিনে জান্‌তে পেরেছি—তোমার স্ত্রী, ভগিনী, সকলেই ভাল, কেবল তুমি নিজের দোষে সোণার সংসার শ্মশান করেছ। অমলা তাহার বাড়িখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করে, সেই টাকা তোমার উদ্ধারের জন্য দিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু পুত্রকন্যাহীনা বিধবা সে বাড়ী বিক্রয় করবে কেমন করে? তাই সে বাড়ী বিক্রয় করা হলো না। অমলার ন্যায় ভগিনী কাহার হয় না। তুমি এ টাকা না নিলে, তার মনে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দেওয়া হবে।

হীরালাল। তা হলে এখন আরো পাঁচ হাজার টাকার দরকার। সে টাকাই বা যোগাড় হবে কি করে?

সুরেশ। আমি তোমার একজন অতি গরীব বন্ধু। কলিকাতায় আমার কোন সম্পত্তি নাই, কিন্তু দেশে আমার যে বাড়ী ঘর জমাজমী আছে, সেই সমস্ত বাঁধা দিয়ে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারবো।

হীরালাল বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর সুরেশচন্দ্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ভাই সুরেশ, তোমার ঋণ আমি এ জীবনে কখন পরিশোধ করতে পারবো না। কিন্তু আমায় ক্ষমা কর, আমি এ রকম করে উদ্ধার হতে চাই না; আমি বরং জেলে গিয়ে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।"

সুরেশ। তুমি সে জন্য দুঃখিত হয়ো না। এ বিপদের সময় আমি যদি তোমার কোন উপকারে আসতে পারি, তবে আমারও জীবনসার্থক মনে করবো। আমিও তোমার নিকট অনেক সময় অনেক উপকার পেয়েছি। আর এ সম্বন্ধে অনুমত করে না। এখন রাত্রি অনেক হয়েছে, আমি আজ আসি, কাল আবার দেখা হবে। আর তোমায় এখানে-সেখানে করে, বেড়াতে হবে না; এই খানেই থাক। ওয়ারেণ্ট ধরবার আর কোন ভয় নেই।

সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় সেই বিষপাত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে ভুলিলেন না। হীরালাল তখন এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন—"আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি! মান, সম্ভ্রম, চরিত্র সকলই গিয়েছে; বিষয় সম্পত্তি যা কিছু আছে তাও যায়। এখন আমি পথের ভিখারী, কেবল আমি একলা কেন—আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মীয় বন্ধুকেও আমি পথের ভিখারী করলুম। আমার মতন নরাধম আর কে আছে?"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশচন্দ্রের চেষ্টায়, হীরালাল পঞ্চাশ হাজার টাকা আফিসের সাহেবদিগকে ক্ষতিপূরণ দিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন কিন্তু হীরালালের এখন আর কিছুই নাই। যাহা আছে কেবল দেনা। হীরালাল আফিস হইতে কখনই এত টাকা আত্মসাৎ করেন নাই; তবে সুতার হিসাবে কিরূপে এত টাকা ঘাটতি পড়িল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, হীরালাল এখন হইতে আবার এ সংসারে নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছেন। অমলার স্বামীর শ্যামবাজারে বাড়ী ছিল। এত দিন তাহার ভাড়া অমলা পাইত, এখন সে ভাড়াটিয়া তুলিয়া দিয়া, হীরালাল সেই বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সে বাড়ীর কতক অংশ আবার ভাড়া দেওয়া হইল; সে ভাড়ার মাসিক আয় কুড়ি টাকা মাত্র। এখন অমলার এই কুড়িটী টাকার উপর নির্ভর করিয়া হীরালালের জননী অতি কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন। সংসারে পরিবারের সংখ্যাও অল্প নহে। হীরালাল, তাহার জননী সাবিত্রী, স্ত্রী শরৎকুমারী, ভগিনী অমলা, এই চারিজন। ইহা ব্যতীত পরেশনাথের সেই কন্যা সুখদা, আর

পুত্র অমরনাথের প্রতিপালনের ভারও এখন অমলার ঘাড়েই পড়িয়াছিল। কারণ হীরালালের সেই বিপদের পর, পরেশনাথের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আপনার পুত্র কন্যার কোন সংবাদও সে আর লইত না। এখন এ সংসারে অন্য কোন দাসদাসী ছিল না, তবে সেই বৃদ্ধা ঝি অন্য বাড়ী চাকরী করিলেও, এই বাড়ীতে রাত্রে শয়ন করিত, এবং বিনা বেতনে অনেক কাজকর্ম্মও করিত। তবে অমলা তাহাকে সে সকল কাজ করিতে দিতে সম্মত ছিল না; কারণ অমলা নিজে কাজ-ছাড়া একদণ্ড থাকিতে পারিত না।

এখন এ সংসারের জীবনই অমলা, কিন্তু অমলা এ সংসারে দাসীর ন্যায় থাকিত, এবং সেইরূপ থাকিতেই ভালবাসিত; একদিন শরৎকুমারী অমলাকে বলিল—"ঠাকুর-ঝি, তুমি না থাক্‌লে আমাদের দশা কি হতো?"

অমলা সে কথা শুনিয়া একটু দুঃখিত হইয়া কহিল—"বউ-দিদি, যখন তখনই তুমি ঐ কথা বলবে? কেন—আমাকে কি পর মনে কর বউদিদি?"

শরৎকুমারী পুনরায় কহিল—"তোমায় যদি পর মনে করবো, তবে আমাদের আপনার লোক আর কে আছে? আমি সে ভাবে বল্‌ছি না। তোমার মতন ঠাকুর-ঝি যদি না থাক্‌তো, কি তোমার স্বামীর এই বিষয় যদি তুমি না পেতে, তবে আমাদের দশা কি হতো? আমরা তা হলেত পথের ভিখারী হয়েছিলাম।"

অমলা।—অমন কথা কি বল্‌তে আছে, বউদিদি। দাদা বেঁচে থাকুন; আবার তোমার সব হবে। বউদিদি, তোমার

পায়ে পড়ি, তুমি আমার দাদাকে সুখী কর, তা হলে আমরা সকলেই আবার সুখী হতে পারবো ; দাদার মুখ বিষণ্ন দেখ্‌লে, আমার প্রাণ ফেটে যায়।

শরৎ। আমি কি করবো, ঠাকুর-ঝি? আমার সে অভি-মান, অহঙ্কার, দর্প এখন সব চূর্ণ হয়ে গেছে। আমিত তাঁকে সুখী কর্‌তে প্রাণপণে চেষ্টা করে থাকি। তিনি এখন সদাই অন্য-মনস্ক ; ঘৃণায়, লজ্জায় ও অনুতাপে এখন তাঁর হৃদয় সর্ব্বদাই দগ্ধ হচ্ছে। আমি এত চেষ্টা করেও তাঁকে সুখী করতে পাচ্ছি না।

অমলা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"কিসের ঘৃণা—কিসের লজ্জা? আমার দাদা কখনও কারো অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহার দ্বারা কোন ঘৃণিত—কি লজ্জাস্কর কাজ যে হতে পারে, তা আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লেও বিশ্বাস করি না।"

শরৎকুমারী অবাক্ হইয়া অমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! অমলা তখন পুনরায় বলিল—"বউদিদি, আমি অহঙ্কার করে বল্‌ছি, আমাদের এমন দিন আবার আস্‌বে, যেদিন দাদার সুখ্যাতি আর এ পৃথিবীতে ধর্‌বে না।"

শরৎকুমারী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমার বড় ভয় হয়, পাছে এই রকম ভেবে ভেবে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। এখন আর অন্য বন্ধুবান্ধব দেখ্‌তে পাই না, কেবল এক সুরেশ বাবু আছেন।"

অমলা। সুরেশ বাবু মানুষ নন, বোধ হয় কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা। আর নয়ত, পূর্ব্বজন্মে আমাদের মায়ের পেটের ভাই ছিলেন ; তা নাহলে এত দুর কি পরে করে?

শরৎ। আমি যা মনে করি, কাজের সময় তার কিছুই করতে পারি না। আমার মনে হয়—আমি প্রাণ দিয়ে তোমার দাদাকে সুখী করি, কিন্তু আমি বড় হতভাগিনী, কাজের সময় কিছুই করতে পারি না। এখন ঘরে বসে—এরূপ ভেবে ভেবে কি করে তাঁর মন ভাল হবে? তুমি আর সুরেশ বাবু আমার ভরসা। তোমরা দুজনে চেষ্টা করলে, নিশ্চয় তাঁকে পুনরায় সুখী করতে পার। আমার দ্বারা সে বিষয়ে যে কিছু হয়—তাতে বোধ হয় না। আমার মরণই ভাল।

অমল। বউদিদি, সুরেশ বাবু সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টায় আছেন। আমিও যতদূর পারি, তোমার সাহায্য করবো। কিন্তু তোমার এরূপ করলে চলবে না।

শরৎ। তোমার সেই পত্র পড়েই সুরেশ বাবু তোমার দাদাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য এতদূর করে ছিলেন। তুমি না হয়, সুরেশ বাবুকে এই বিষয়ের জন্যও আর একখানা পত্র লেখ না। তোমার ওপরই এখন আমাদের সকল নির্ভর করছে।

অমলা। তাঁকে পত্র লিখতে হবে কেন? তিনি নিজের মুখেই বলেছেন—অন্য লোকে আফিসের যে সকল টাকা চুরি করে, দাদাকে এই পঞ্চাশ হাজার টাকার দায়ী করেছে, তাদের চুরি তিনি ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় আছেন। আর দাদার যাতে পুনরায় ঐ আফিসেই চাকরী হয়, তিনি এখন সে চেষ্টাও করছেন।

শরৎকুমারী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"ভগবান সুরেশ বাবুর মঙ্গল করুন

এই সময় সাবিত্রী সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন—"মা অমলা, আজত ঘরে আর চাল নেই, হীরু এমন করে, ঘরে বসে থাক্‌লে কি করে সংসার চল্‌বে? কিন্তু এখন আমি কি করি?"

অমলা তৎক্ষণাৎ বলিল—"দাদাকে কোন কথা বলো না মা। আমি তার উপায় কর্‌ছি।"

এই কথা বলিয়া অমলা তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই কোথা হইতে দুইটি টাকা আনিয়া জননীর হাতে দিল। সাবিত্রী তখন অবাক্ হইয়া কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল এখন আর বাড়ীর বাহির হয় না। কারণ তাহার লোকলজ্জার ভয়ও ছিল, অন্য আর এক ভয়ও ছিল। সে ভয় অন্য কিছুই নহে—এখনও হীরালালের হৃদয়ে এতদূর বল হয় নাই যে; হীরালাল পূর্ব্ব প্রলোভনে জয়ী হইতে পারেন। সুরেশ বাবুর চেষ্টায় সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের দুই এক দিন পরেই, পুনরায় হীরালালের সুরাপানেচ্ছা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। হীরালাল এত চেষ্টা করিত, তথাপি সে পাপ ইচ্ছাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিত না। সন্ধ্যার পরই হীরালালের এই পাপ ইচ্ছা এতদূর প্রবল হইত যে, হীরালাল তখন এক অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বেড়াইত। আপনার অবস্থা আপনি অনুভব করিয়া হীরালাল বিস্মিত হইত। হীরালালের শিক্ষার আর বাকি কি? হীরালাল কি ছিল, এখন কি হইয়াছে! অথচ এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনেও হীরালালের সুরার প্রতি ঘৃণা জন্মিল না কেন? এ প্রশ্ন শত শতবার হীরালালের মনে উদয় হইয়াছে, কিন্তু হীরালাল তাহার কোন মীমাংসা করিতে সক্ষম হন নাই।

এ সময় হীরালালের হস্তে অর্থ থাকিলে, হীরালাল যে পুনরায় সুরাসক্ত হইয়া পড়িতেন না, এ কথা আর আমাদের মনে স্থান পায় না।

একজন শিক্ষিত যুবকের এরূপ পরিণাম বড়ই শোচনীয় বিষয়। সুরার কি মোহিনী শক্তি! যাহার জন্য, হীরালাল আজ সর্ব্বস্বান্ত;—যাহার জন্য তাঁহাকে যশ, মান, খ্যাতি চরিত্র সমস্তই জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে; তাহার সেই পাপ চিন্তা হীরালাল আজিও পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মানুষ কি এতই অভ্যাসের দাস? যে শিক্ষা এরূপ কু-অভ্যাসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে না, সে শিক্ষায় ধিক্। যে চরিত্র হইতে একবার কলঙ্কের দাগ এত চেষ্টায়ও দূর করা যায় না, সে চরিত্রে ধিক্! যে হৃদয় এরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তনের পরও সংশোধিত হয় না, সে হৃদয়কেও ধিক্।

হীরালাল নির্জ্জনে বসিয়া আপনার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় সুরেশচন্দ্র আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য দুই এক কথার পর সুরেশ বাবু বলিলেন—"তুমি এরূপ অনর্থক সময় নষ্ট করলে চলবে না; তোমার গলায় এত বড় সংসার—কোন রকম উপার্জ্জনের চেষ্টা কর।"

হীরালাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"ভাই সুরেশ, তোমার মতন বন্ধু আমার আর এ পৃথিবীতে নাই, তোমার কাছে কোন কথা গোপন করবো না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের এখনও বাকি আছে! এখনও সন্ধ্যার পর একটু মদের জন্য আমার মন অস্থির হয়ে পড়ে। ভাই, আমি এত

চেষ্টা করছি, তথাপি আমার মনকে বশ করতে পাচ্ছি না। কি অশুভক্ষণেই মদ খেতে শিখেছিলুম—এ বিষ কেউ যেন কখন স্পর্শ না করে।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"তুমি এরূপ চুপ করে বসে থাক্‌লে, ঐ সব কু-প্রবৃত্তি মনের মধ্যে আস্‌বেই ত। উপার্জ্জনের কোন উপায় স্থির করতে না পার, পরোপকারে জীবনকে উৎসর্গ কর। পূর্ব্বে সে কাজেত তোমার বিশেষ আনন্দ ছিল। তুমি ত পরের কাজ পেলে, নিজের কাজ ভুলে যাও। এখন সে পরোপকারেও তোমার উৎসাহ নাই কেন?"

হীরালাল। আমি কোন্ মুখে আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবো? কে আর আমার ন্যায় নরাধমের কাছে উপকার প্রত্যাশা করবে?

সুরেশ। তোমার এতদূর অনুতাপ হয়েছে, অথচ মদের প্রতি এখনও তোমার ঘৃণা হলো না। তোমার এ অনুতাপ কি তবে আন্তরিক নয়?

হীরালাল। আমি এত নীচ হয়ে পড়েছি যে, তুমিও আর আমায় বিশ্বাস কর না। আমি তোমার কাছে কি কেবল মুখে অনুতাপের ভাণ করবো? ভাই সুরেশ, তুমি আমার অবস্থা বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, এ অবস্থা তোমায় বুঝাইতেও আমার ক্ষমতা নাই। আমি নিজে মদের পরিণাম সব বুঝ্‌ছি, সব জান্‌ছি —এই মদেরই জন্যে যেরূপ বিপদে পড়েছিলুম, এরূপ বিপদে একজন শত্রুও যেন না পড়ে; তবুও এই মুহূর্ত্তে কেউ যদি আমায় এক গেলাস মদ এনে দেয়, আমি অমৃতজ্ঞানে আগ্রহের সহিত তা এখনি পান করি। ভাই, আমার অবস্থা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌লে কি?

সুরেশচন্দ্রের চক্ষে এই সময় কোথা হইতে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সে অশ্রুবিন্দু মুছিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"তোমায় আমি কিছুতেই সুখী করতে পারলাম না। তোমার এ অবস্থা শুনলে আমার প্রাণ ফেটে যায়। আজ একটা শুভ সংবাদ দিতে আমি এসেছি, কিন্তু তোমার মর্ম্মান্তিক কথা শুনে শুনে— আমি সে কথাও ভুলে গেছি। আফিসের যে টাকার দায়ী হয়ে, তুমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছ, সে টাকা যে তুমি একলা চুরি কর নাই, সে বিশ্বাস সাহেবদের হয়েছে। সদরমেট, গুদাম সরকার প্রভৃতিও যে তোমার অসাবধানতার দরুণ অনেক টাকা চুরি করেছে, তার প্রমাণ সাহেবেরা পেয়েছেন। আফিসে তাই নিয়ে একটা হুলস্থূল পড়েছে। আর তোমার অবস্থার কথা শুনে, সাহেবদের মনে দয়াও হয়েছে। শেষে কি দাঁড়াবে জানি না, বোধ হয়—এ ঘটনায় তোমার ভাল হতে পারে।"

হীরালাল বিস্মিতনেত্রে অনেকক্ষণ সুরেশচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"ভাই সুরেশ, তোমার ঋণ আমি এ জীবনে কখনও পরিশোধ করতে পারবো না। আমি বেশ বুঝতে পারছি এ সকলই তোমার চেষ্টায় হচ্ছে। কিন্তু ভাই, আমার মনের পরিবর্ত্তন না হলে, কিছুতেই আমি সুখী হতে পারবো না।"

সুরেশ চন্দ্র বলিলেন—"তোমায় আমি আর কি উপদেশ দিব? এরূপ চুপ করে, আর বসে থেকো না। না হয়, ঘরে বসে ধর্ম্মকর্ম্মে মন দাও, তাহলেও তোমার মন ভাল হতে পারবে। আজ আমি আসি, কাল আবার দেখা করবো।"

এই কথা বলিয়া সুরেশ চন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন; হীরা-

লাল মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই গৃহে অমলা প্রবেশ করিল। অমলা তাহার দাদাকে এরূপ বিষণ্ণমনে চিন্তা করিতে দেখিয়া, মনে মনে বড় ব্যথা পাইল। অমলা তৎক্ষণাৎ বলিল—"দাদা, তুমি কি ভাব্‌ছ? তোমার কিসের ভাব্‌না? যা হবার হয়ে গেছে, তার জন্যে ভেবে ভেবে নিজের শরীর মাটি কর কেন দাদা?"

অমলার এই মিষ্ট কথায় হীরালালের সেই প্রাণের জ্বালা, অগ্নিতে জলসিঞ্চনের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইল। হীরালাল ধীরে ধীরে বলিলেন—"অমলা, তুমি সরলা বালিকা, আমার ন্যায় পাপীর ভাবনা তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। কিন্তু আমি অতি নরাধম, তুমি আর আমায় দাদা বলে ডেকো না।"

হীরালালের একথা অমলার মনোমত হইল না। এখনও ভ্রাতার প্রতি অমলার ভক্তি অচলা; হীরালালের কথায় সে ভ্রাতৃভক্তির প্রবলস্রোতে হঠাৎ যেন একটা বাধা পড়িল। অমলা সেই জন্য উত্তেজিত স্বরে বলিল—"আমি তোমায় দাদা বলে ডাকবো না! আমার দাদার মতন দাদা আর কার আছে? আমি আর কিছুরই অহঙ্কার করি না, কেবল আমার দাদার অহঙ্কার করি।"

হীরালালের চক্ষে জল আসিল। হীরালাল সজলনেত্রে বলিলেন—"তোমার হৃদয় নির্ম্মল, তোমার মন সরল, তাই সকলকেই নির্ম্মল ও সরল দেখ। কিন্তু আমার ন্যায় নরাধম বোধ হয় এ পাপ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। এক মায়ের উদরে জন্মগ্রহণ করলেও, তুমি স্বর্গ আর আমি নরক। তোমায় আমি আর কি বলবো—আমি এমনই নরাধম যে এরূপ অব-

হাতেও আমার চৈতন্য হয় নাই। যে মদে আমার এই সর্ব্বনাশ হয়েছে, সেই মদের জন্য এখনও আমি লালায়িত। আমি—"

হীরালাল আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। হীরালাল নীরবে অবনত মস্তকে রোদন করিতে লাগিলেন। যখন পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অমলার দিকে চাহিলেন, তখন যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! হীরালাল দেখিলেন—অমলার চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু!

কি! অমলার চক্ষে অশ্রুবিন্দু! ভ্রাতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ভ্রাতৃগতপ্রাণা ভগিনীর চক্ষে দুইটি পবিত্র অশ্রুবিন্দু! সেই দুইটি ক্ষুদ্র—অতিক্ষুদ্র—বিন্দুর আবার কি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা! ভগিনীর সেই পবিত্র—অতি পবিত্র—অশ্রুবিন্দুতে ভ্রাতার হৃদয়নিহিত পাপতৃষ্ণা যেন তৎক্ষণাৎ মিটিয়া গেল! হীরালালের সে পাপ প্রবৃত্তি আর নাই। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে হীরালাল ছিল, এখন আর সে হীরালালও নাই। হীরালাল কি স্বপ্ন দেখিতেছেন না কি?

মাতার শত শত অনুরোধ—স্ত্রীর মর্ম্মভেদী অভিমান—বন্ধুর সানুনয় উপরোধ এবং আত্মীয় স্বজনের তীব্র গঞ্জনা ও লাঞ্ছনায় যাহা ঘটে নাই, সেই অসম্ভব ঘটনা এখন মুহূর্ত্তের মধ্যে সংঘটিত হইল! ইহাঁদের লক্ষ লক্ষ অশ্রু বিন্দু যে কার্য্য করিতে এতদিন অক্ষম ছিল, সেই কার্য্য আজ অমলার দুই বিন্দু মাত্র অশ্রু সক্ষম হইল। অমলা কে?

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরেশনাথ কোথায়? এ সংসারে আর কে তাহার সংবাদ লইবে? কেবল একমাত্র সুখদা এখনও তাহার নিষ্ঠুর পিতাকে ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু পরাশ্রিতা ক্ষুদ্র বালিকা কিরূপে তাহার পিতার অনুসন্ধান করিবে? কেন এরূপ হইল? হীরালালের সেই বিপদের দিন পুত্রকন্যাকে ফেলিয়া হঠাৎ পরেশনাথ কোথায় চলিয়া গেল? হীরালালের এখন সাংসারিক অবস্থা মন্দ হইলেও অমলার যত্নে সুখদা ও তাহার ভ্রাতা অমরনাথের কোন কষ্ট ছিল না; অমলা নিজে পেটে না খাইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইত। অথচ সময়ে সময়ে সুখদার মনে সুখ ছিল না, কেবল পিতার সংবাদ পাইবার জন্য সুখদা অনেক সময় বিষণ্ণ থাকিত। সুখদা তাহার সে মনোকষ্ট আর কাহার কাছে বলিবে? সুখদার বিষণ্ণমুখ দেখিলে, আর কাহারই বা প্রাণ ফাটিবে? অমলা একদিন জিজ্ঞাসা করিল—"সুখদা, তোর কোন কষ্ট হলে আমায় বলিস্। আমি মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই—তুই বসে বসে কি ভাবিস্। তুইত ছেলে মানুষ, তোর আবার এত ভবনা কিসের মা?"

সুখদা যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"না মা, আমার

অন্য কষ্ট নেই। তবে বাবার জন্যে বড় মন কেমন করে, আমি অনেক দিন তাঁর কোন খবর পাইনে।"

বালিকা কথা কয়েকটি বলিয়াই বিষণ্ণ মুখখানি অবনত করিল। সুখদার সে ভাব দেখিয়া অমলার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। অমলা তখন আর কোন কথা বলিল না, কিন্তু বুঝিতে পারিল যে, বালিকার বিষণ্ণতার যথেষ্ট কারণ আছে। এতদিন অমলা যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় এ কথা তাহার মনে উদয় হইতে পারে না। এখন অমলা আর কি করিবে? পরেশনাথের সংবাদের জন্য তাহার ভ্রাতাকে অনুরোধ করিল। হীরালালও এতদিন পরেশনাথের বিশেষ কোন সংবাদ জানিতেন না। তবে সে যে এই কলিকাতাতেই আছে, এ কথা জানিতেন। আর পরেশনাথের প্রকৃতিও হীরালাল জানিতেন; সুতরাং তাঁহার বিপদের সময় পরেশ নাথের অদর্শনে, তিনি বিস্মিত হন নাই। তাঁহার বিপদই যে পরেশনাথের অদর্শনের কারণ, তিনি মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন। আজ অমলার কথায় হীরালালও পরেশনাথের সংবাদ লইবার জন্য বড় উৎসুক হইলেন। তিনি কিরূপে তাহার অনুসন্ধান পাইবেন—মনে মনে চিন্তা করিতে-ছেন; এমন সময় সুরেশ বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। সুরেশ বাবুকে দেখিয়া হীরালালের প্রথম প্রশ্ন হইল—"আচ্ছা সুরেশ, তুমি পরেশের কোন সংবাদ জান কি?"

সুরেশচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কেন—সে কুলাঙ্গারের সংবাদে তোমার দরকার কি?"

হীরালাল। তুমি কি জান না, তাহার ছেলে মেয়ে আমার বাড়ীতে রয়েছে।"

সুরেশ। তা জানি--আবার তাকেও এনে বাড়ীতে রাখ্‌বে না কি?

হীরালাল। আমার যা অবস্থা, তাতে আমি নিজেই খেতে পাই না, তা তাকে এনে রাখ্‌বো কোথা থেকে?

সুরেশ। না—পরেশনাথের দায় থেকে তুমি এখন নিশ্চিন্ত হতে পার—সে এখন পাগ্‌লা গারোদে আছে।

হীরালাল বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে কি! পরেশ পাগল হয়েছে? তাত আমি কিছুই জানিনে!"

সুরেশ বাবু বলিলেন—"মদের পরিণাম! পাপের শাস্তি কি এ পৃথিবীতে হয় না মনে কর না কি? পাপের শাস্তি এই পৃথিবীতেই হয়। আর তোমার পরেশনাথের জীবনীত এক-খানি মদের পরিণামের ইতিহাস। ভদ্র সন্তান মাতাল হলে যে কতদূর নীচ হতে পারে, তা পরেশনাথই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

হীরালাল। সেইত আমার সর্ব্বনাশ করেছে। তারই কুচক্রে পড়ে, আমি সেই বিষ খেতে শিখেছিলুম।

সুরেশ। শুধু তোমার কেন—তোমার মতন কত শত লোকের ঐ পরেশ সর্ব্বনাশ করেছে।

হীরালাল। এখন সে সব কথা মনে হলে, আমার তার উপর বড় ঘৃণা হয়।

সুরেশ। আরো ঘৃণার কথা বলি শুনি। তুমি যখন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াইতে লাগ্‌লে, আমি তোমারই অনুসন্ধা-

নের জন্য প্রথমে পরেশনাথকে খুঁজে বেড়াই। অনেক অনুসন্ধানের পর, একদিন তাকে ধরেছিলুম। দেখলুম, পরেশনাথের আর সে শ্রী নাই; তুমি বল্লে বিশ্বাস করবে না—পরেশনাথ রাস্তার লোকের কাছে পয়সা ভিক্ষে করে মদ খাচ্ছে। আমি তোমার কথা আর তাকে জিজ্ঞেস করলুম না। পরেশনাথের অবস্থা দেখে, তখন তোমার জন্য আমার প্রাণ কেঁদে উঠলো। আমি চখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে সেখান থেকে চলে এলুম।

সুরেশ বাবুর কথা শুনিয়া, হীরালাল শিহরিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তারপর পরেশ পাগলা গারোদে গেল কেন?"

সুরেশ। পাগোল হয়েছে বলেই, পাগলা গারদে গেছে। এ রকম মদ খেয়ে বেড়ালে, শেষ পাগল হবে না ত কি হবে? রাস্তার পাগল বলে পুলিস ধরে নিয়ে গিয়ে, এখন পাগলা গারদে রেখেছে। আমি তাকে সেখানেও একদিন দেখতে গিয়েছিলুম; কিন্তু রবিবার ভিন্ন অন্য বারে বাহিরের লোককে দেখতে যেতে দেওয়া হয় না; তাই দেখা হলো না।

হীরালাল তখন আগ্রহের সহিত কহিলেন—"আজ ত রবিবার। চল না ভাই, আজ একবার তাকে দেখে আসি।"

সুরেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"তা চল! এখন তাকে দেখলে পুণ্য আছে। অন্ততঃ মদের পরিণাম দেখে, মদের প্রতি একটা চিরস্থায়ী ঘৃণা হতে পারবে।"

সেই দিন বৈকালে হীরালাল ও সুরেশ বাবু বাতুলাশ্রমে পরেশনাথকে দেখিতে গেলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গড়ের মাঠের দক্ষিণাংশে আলিপুরের সীমানায় এই বাতুলাশ্রম। বাতুলাশ্রমটী যেন একখানি প্রকাণ্ড বাগান বাড়ী। চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত; কেবল উত্তর দিকে একটি প্রবেশের পথ। গেটের পার্শ্বেই দ্বাররক্ষকের গৃহ, আর এই গেট হইতেই দুই দিকে দুইটী রাস্তা ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুইধারে শ্রেণীবদ্ধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাউ গাছ শ্রেণী। গেটে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার এক-তল বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বাড়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কুঠারীতে বিভক্ত, এবং লোহার রেলের দ্বারা সম্মুখদিকে দৃঢ়ীকৃত। ভিতরদিকের অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রাঙ্গণে একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যান। সে উদ্যান দেশী বিলাতী নানা পুষ্পবৃক্ষ-সুশোভিত দিনের বেলা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠারীগুলি শূন্য পড়িয়া থাকে সন্ধ্যার সময় প্রত্যেক কুঠারীতে এক এক জন বাতুলকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা হয়। আবার প্রাতঃকালে পিঞ্জর হইতে তাহারা মুক্তিলাভ করে। প্রথমতঃ বাতুলেরা দুইটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত। যাহারা ফৌজদারী আসামীরূপে পুলি[illegible] কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, তাহারা এক বিভাগ; আর যাহারা ডাক[illegible]

রের সার্টিফিকেট সহিত কোন আত্মীয় স্বজনের দ্বারা প্রেরিত হয়, তাহারা অন্য বিভাগ। এই দ্বিতীয় বিভাগের বাতুলগণের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য মাসে মাসে নির্দ্ধারিত অর্থ দিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর বাতুলকে মাসিক ৫০৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর বাতুলকে মাসিক ২০৲ টাকা, আর তৃতীয় শ্রেণীর বাতুলকে মাসিক ১২৲ টাকা করিয়া প্রতিমাসে অগ্রিম দিতে হয়। পুলিস প্রেরিত বাতুলের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট নিজ হইতে বহন করিয়া থাকেন; সেই কারণ তাহাদিগকে কারাগৃহের ন্যায় কঠিন পরিশ্রমও করিতে হয়। দ্বিতীয় বিভাগের বাতুলগণেরও পরিশ্রমের ব্যবস্থা আছে; কারণ ডাক্তারদিগের মতে ঔষধ অপেক্ষা পরিশ্রম এ রোগের বিশেষ উপকারী।

এখানে কিরূপ পরিশ্রমের ব্যবস্থা আছে বলিতেছি। পাগল যখন নানা রকমের, তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পাগলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিশ্রমের ব্যবস্থাও আছে। যাহারা জ্ঞানশূন্য উন্মাদ; তাহারা আর পরিশ্রম করিবে কি? চিঁড়িয়াখানার হিংস্রক জন্তুর ন্যায় কেবল পিঞ্জরাবদ্ধ থাকে। যাহাদের কঠিন পরিশ্রমের ব্যবস্থা হয়, তাহাদিগকে পাথর-ভাঙ্গা, ঘানি-টানা প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। পুলিস-প্রেরিত বাতুলেরা প্রায়ই এইরূপ কঠিন পরিশ্রম করিয়া থাকে। যাহাদের লঘু পরিশ্রমের ব্যবস্থা, তাহারা ফুলগাছে জল দেওয়া, চট্ বা কাপড় বোনা প্রভৃতি কার্য্য করে।

এই আশ্রমের মধ্যস্থলে একটী দ্বিতল গৃহ। সেই গৃহে এই আশ্রমের প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী বাস করেন। তাহার পর আর একটী প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, সেই প্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে দুর্দ্দান্ত

বাতুলদিগের থাকিবার এক গৃহ আছে। এই স্থানে তাহাদিগকে রাখা হয়, কারণ এখান হইতে তাহাদের পলায়ন করিবার আর উপায় থাকে না।

পরেশনাথকে বাতুলাশ্রমের এই স্থানেই রাখা হইয়াছিল। এই স্থানেই পরেশনাথ বনাহিংস্রক জন্তুর ন্যায় পিঞ্জরাবদ্ধ। হীরালাল ও সুরেশ বাবু এই আশ্রমে আসিয়া পরেশনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, একজন জমাদার সেই পিঞ্জরাবদ্ধ পরেশনাথকে তখন দেখাইয়া দিল। কিন্তু তাঁহারা সে পরেশনাথকে হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না। পরেশনাথ তখন উলঙ্গ অবস্থায় সেই পিঞ্জরের এক স্থানে বসিয়াছিল। পিঞ্জরের মধ্যে এই আশ্রমের চিহ্নিত এক খানা বস্ত্র পড়িয়াছিল। পরেশনাথ কিন্তু কিছুক্ষণ হীরালালের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল। চিনিতে পারিয়া একটা বিকট হাস্যের সহিত তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বিড় বিড় করিয়া মনে মনে কি বকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পরেশনাথ আবার একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। পরেশনাথ হীরালালকে চিনিতে পারিয়াও কিন্তু কথা কহিল না; কারণ কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াও কহিতে পারিল না। মধ্যে মধ্যে মনুষ্যের অবোধ্য ভাষায় কি বলিতেছিল, কিন্তু সে ভাষা হীরালাল ও সুরেশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না।

এই সময় বাতুলাশ্রমের একজন কর্ম্মচারী সেই থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হীরালাল ও সুরেশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনাদের সঙ্গে এ ব্যক্তির কোন সম্বন্ধ আছে না কি?"

বলে. আমি যদি না দেখি, তবে আমার ধর্ম্মে সবে কেন? আমায় কাজ করতে না দিবে, আমি মাথা খুঁড়ে মরবো।"

হীরালালও নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্ত্রী মন্দ হইলে যে তাহার উপর রাগ করিয়া, নিজে অধঃপাতে যাইতে হইবে, এরূপ ভয়ঙ্কর ভ্রম হীরালালের কেন হইয়াছিল, এখন অনেক সময় হীরালাল সেই কথাই ভাবিত। আরো হীরালাল এখন বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শরৎকুমারী তাহাকে যথার্থই প্রাণের সহিত ভালবাসে। মুখে যতই ছ্যাকা বলুক না কেন, তাহার হৃদয়ের ভিতর অসীম ভালবাসা লুক্কায়িত আছে। শরৎকুমারীর প্রণয়তরুর সুস্নিগ্ধ ছায়ায় হীরালালের দাবাগ্নিদগ্ধপ্রাণ এখন সুশীতল হইয়াছে। যে শরৎকুমারীকে দেখিলে পূর্ব্বে হীরালালের প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিত, এখন সেই শরৎকুমারীকে এক দণ্ড না দেখিতে পাইলে, হীরালাল চারিদিক শূন্য দেখিতেন।

আর অমলার কথা আমরা কি বলিব? এ সংসারের কুলান অকুলানের প্রতি অমলা সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিত। আমল ইচ্ছা করিয়া প্রতিদিন অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইত, অমলা ছিন্ন বস্ত্র শেলাই করিয়া নিজে পরিধান করিত, এবং দুঃখের সংসারে কাহার কোন কষ্ট নাই, এই কথা জানিতে পারিলেই, যেন স্বর্গ হাতে পাইত!

সাবিত্রীও সকল সময় কন্যার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। এখন এ সংসার দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল অর্থের দ্বারা সাংসারিক সুখ হয় না, সাংসারিক সুখ অর্থে নাই, সাংসারিক সুখ আছে—সংসারীর মনে।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখের পর দুঃখ ভাল, না দুঃখের পর সুখ ভাল? অনেকের মতে দুঃখের পরই সুখ ভাল। আমরা বলি—সুখ আর দুঃখ লইয়াই যখন জীবন, তখন তাহার অগ্রপশ্চাতে আবার ভালমন্দ কি? দুঃখের পর সুখই হউক, আর সুখের পর দুঃখই হউক—সকল অবস্থাতেই আমাদিগকে ধীর ও স্থির থাকিতে হইবে। সুখে যে উন্মত্ত হয় না, দুঃখেও যে অস্থির নয়—সেই মানুষ। সুখ দুঃখ মনুষ্য জীবনের জোয়ার ভাঁটার স্বরূপ। যে নদীতে জোয়ার ভাঁটা নাই, সে নদীও নদীই নয়। হয় সে কাণা নদীর ন্যায় ক্ষুদ্র তটিনী, আর না হয় ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় অতি ভীষণ অবিশ্বাসী—ভয়ঙ্কর নদ। এপৃথিবীতে সকলেই সুখের জন্যই লালায়িত; দুঃখকে আর কেহ চায় না; কিন্তু না চাহিলেও সে বেচারী আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। এদিকে কিন্তু যে কখন দুঃখের আস্বাদ পায় নাই; সে কি সুখের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়? আবার সেইরূপ যে কখন সুখের আস্বাদ গ্রহণ করে নাই, সে কি দুঃখের তিক্ত আস্বাদনের তীব্রতা অনুভব করিতে পারে?

হীরালালেরও এ দুঃখের অবস্থা চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারে না। একদিন বৈকালে সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি হীরালালের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"ভাই, এত দিন পরে, আমার পরিশ্রম

হীরালাল উত্তর করিলেন—"কোন সম্বন্ধ নাই, তবে পরি-
চিত বটে, তাই আজ দেখ্‌তে এসেছি। এর এই অবস্থা
দেখে, আমরাও আশ্চর্য্য হয়েছি। এ রকম পাগল কি কখন
আরাম হয় মহাশয়?"

কর্ম্মচারী। এখানকার ডাক্তারেরা বলেন—এ পাগল কখন
আরাম হয় না; তবে এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হতে পারে।

হীরালাল। এরূপ পাগল হবার কারণ তাঁরা কি স্থির
করেছেন?

কর্ম্মচারী। এ ব্যক্তি মদ খেয়ে খেয়ে পাগল হয়েছে।
এখন মদের প্রতি এর কিরূপ বিতৃষ্ণা হয়েছে দেখ্‌বেন?

এই কথা বলিয়া সেই কর্ম্মচারী একজন চাকরকে একটা
বোতল ও গেলাস আনিতে বলিলেন। বোতল আর গেলাস
আনিবামাত্র পরেশনাথের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তখন
পরেশনাথ যেন প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পিঞ্জ-
রের এক কোণে দাঁড়াইয়া বিকট চীৎকার আরম্ভ করিল।
কোন রূপ জীবনহানিকর বস্তু সম্মুখে দেখিলে, প্রাণভয়ে লোকে
যেরূপ চীৎকার করে, এ চীৎকার সেইরূপ! ভূতগ্রস্ত রোগী
সম্মুখে ওঝা দেখিলে যেরূপ চীৎকার করিয়া উঠে—এ চীৎকার ও
তাহার অনুরূপ।

সেই কর্ম্মচারীর আজ্ঞায় সে স্থান হইতে সেই বোতল ও
গেলাস স্থানান্তরিত হইলে পর, পরেশনাথ কিছুক্ষণ হাঁপাইতে
আরম্ভ করিল। হীরালাল ও সুরেশচন্দ্র তখন আর সে স্থানে
থাকিতে পারিলেন না। উভয়ে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সেস্থান
হইতে প্রস্থান করিলেন। সে চক্ষের জল কি পবিত্র!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুখদা তাহার পিতার সংবাদ পাইল, কিন্তু সে সংবাদে সুখদা সুখী হইল না। অমলা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইল, এবং তাহার পিতা যে পরে আরোগ্যলাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, সে বিশ্বাসও তাহার মনে দৃঢ় করিয়া দিল। সুখদা সেই আশায় বুক বাঁধিয়া রহিল।

শরৎকুমারী এখন আর সে শরৎকুমারী নাই। এখন আর সেরূপ কথায় কথায় তাহার অভিমান ও নাই; অতিরিক্ত অভিমানের ফল স্বচক্ষে দেখিয়া শরৎকুমারী এখন বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে। এখন এই দুঃখের সংসারে শরৎকুমারী কোন বিষয়েই আর মান-অপমান জ্ঞান করিত না, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সংসারের কাজকর্ম্ম করিত। তবে সেই প্রখরা ঝি অনেক সময় তাহাকে কাজকর্ম্ম করিতে দিত না। সে এখন নিকটেই অন্যের বাড়ী চাকরী করিত, কিন্তু অবসর পাইলেই হীরালালের বাড়ী দৌড়িয়া আসিত, আর রাত্রিতে এইখানেই শয়ন করিত। শরৎকুমারী ও অমলা তাহাকে কাজকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত—"কেন মা? আমরা গতর খাটিয়ে খাই বলে, কি আমাদের পরকালের ভয় নেই? এতকাল যার নুন খেয়েছি, এখন তার সময় মন্দ হয়েছে

সফল হয়েছে। আজ আফিসে হুলস্থূল পড়ে গেছে। সদর মেট, গুদাম সরকার, কেশিয়ার সকলেরই চুরি ধরা পড়েছে। তুমি যে এত টাকা ভাঙ্গ নাই; তা সাহেবেরা এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন। কাল থেকে তোমায় আফিস যেতে হবে। আমার মুখে তোমার অবস্থার কথা শুনে, বড় সাহেবের বড় দয়া হয়েছে। তোমার কাছ থেকে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা লওয়া হয়েছে, সে টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করে তোমার ফেরত দেওয়া হবে। এই সকল কথা তোমায় বলতে বড় সাহেব আমায় এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

হীরালাল অবাক্ হইয়া সুরেশচন্দ্রের এই সকল কথা শুনিতে লাগিলেন। অন্য কেহ এরূপ কথা বলিলে, হীরালাল কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না; কিন্তু সেই প্রাণের বন্ধু সুরেশের কথায় কি হীরালালের অবিশ্বাস হইতে পারে? হীরালাল অনেকক্ষণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এ কি স্বপ্ন না সত্য? কেবল এই কথাই তখন হীরালালের মনে বারংবার উদয় হইতে লাগিল। হীরালালের মুখে আর কোন কথাই নাই। সুরেশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন—"আমার মুখে তোমার সকল কথা শুনে, আফিসের অন্যান্য সকলেই তোমার জন্য দুঃখিত। আর তুমি না হলে, ও আফিসের কাজও চলবে না। গত বৎসরের হিসাব পরিস্কার হয়-নি বলে, এবারের মেলে বড় কড়া চিঠি এসেছে। আর তুমি না থাকায়, কাজের যে বিশেষ ক্ষতি হয়; সাহেবেরা এখন তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন।"

হীরালাল এইবার বলিলেন—"ভাই সুরেশ, তোমার কথা শুনে, আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা তোমায় আর কি

বল্‌বো? তোমা হতেই আবার আমার নষ্ট সম্পত্তি, মান, সম্ভ্রম যে সমস্তই ফিরে পাবো, এখন আমার সে আশাও হয়েছে। তোমার ঋণ আমি এ জীবনে কখন পরিশোধ করতে পার্‌বো না।"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—"হীরালাল, তুমি কি তবে এর জন্য আমায় ধন্যবাদ দিচ্ছ নাকি?"

হীরালাল বলিলেন—"তোমায় আবার ধন্যবাদ কি দিব? তুমি একটু বসো, আমি একবার এ সংবাদ মাকে দিয়ে আসি।"

হীরালাল বাড়ীর মধ্যে গিয়া ডাকিল—"মা!"

আনন্দোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠস্বরের সেই ক্ষুদ্র 'মা' শব্দটী সাবিত্রীর শুষ্ক আনন্দসাগরে পুনরায় সুখের তরঙ্গ তুলিল। সাবিত্রী দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন—"কি বাবা?"

হীরালাল প্রথমে মুখে কোন কথা না বলিয়া ভক্তিভরে জননীর চরণে প্রণত হইলেন। জননী আনন্দাশ্রু মুছিতে মুছিতে পুত্রের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হীরালাল বলিলেন—"মা, সাহেব আবার আমায় চাক্‌রী দেবার জন্য ডেকেছেন, কাল থেকে আমায় আফিসে বেরুতে হবে। আর আফিসের তত টাকা যে আমি ভাঙ্গিনি; তা সাহেবেরা এখন জান্‌তে পেরেছেন। আমার যে পঞ্চাশ হাজার টাকাও ফেরত পাবার আশা আছে।"

সে সংবাদে জননী আনন্দে অধীরা হইয়া দেবদেবীর পূজা মানসিক করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী এবং অমলাও সেইখানে ছুটিয়া আসিল। শরৎকুমারী আনন্দে একটা আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। অমলা আনন্দে ক্রোড়স্থিত অমরনাথের মুখচুম্বন করিল।

*   *   *   *   *   *

হীরালাল পুনরায় তাঁহার সেই পৈতৃক বাড়ীতে আসিয়াছেন। যে লোক বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন, তাঁর সুদ সমস্ত টাকা ফেরৎ পাইয়া, তিনি সেই বাড়ী পুনরায় হীরালালকে বিক্রয় করিয়াছেন। আফিসে হীরালালের সম্মান এখন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আত্মীয়বন্ধু সকলেই যেন এখন হারানিধি কুড়াইয়া পাইয়াছে।

অমলার ও সুরেশের সমস্ত টাকা হীরালাল তাহাদিগকে ফেরৎ দিয়াছিলেন, কিন্তু অমলা সে টাকা লইয়া কি করিবে? ভ্রাতার ন্যায় ভগিনীর জীবনও পরের জন্য। অমলা অনেক টাকা খরচ করিয়া এক সুপাত্রে সুখদার বিবাহ দিল আর অমরনাথের লেখাপড়াশিক্ষারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিল। সেই চিরদুঃখিনী বালিকা সুখদার এখন সুখের সীমা রহিল না।

হীরালালের সংসার এখন সুখের সংসার হইয়াছে। হীরালালের সুখ্যাতি এখন আবার সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অমলার ভবিষ্যদ্বাণী এতদিন পরে ফলিয়াছে। শরৎকুমারীর সে কথা মনে ছিল, একদিন বৈকালে ছাদের উপর বসিয়া উভয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শরৎকুমারী বলিল—"ঠাকুর-ঝি, তোর এত গুণ—তা আমি আগে জানতুম না।"

অমলা নিজের গুণ নিজে বুঝিতে পারিত না, এবং নিজের সুখ্যাতি শুনিতেও কখন ভালবাসিত না; সেই কারণ বলিল—"আমার, আবার গুণ কি বউদিদি?"

শরৎ।—তোর কোন্ গুণের কথা রেখে, কোন গুণের কথা বলবো ঠাকুর-ঝি? তোর গুণ কখন কি ভুলতে পারবো?

অমলা।—আমিত এ সংসারে বৃথা জন্মেছিলুম বউদিদি। আমার দ্বারা কি কখন কারু উপকার হতে পারে?

শরৎকুমারী এবার একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—"তবে আমার এত সুখ—এত ঐশ্বর্য্য আবার হলো কেন? তুই যদি না থাকতিস্—কি তোর যদি এত গুণ না থাকতো, তবে আমার আজ কি অবস্থা হতো একবার ভেবে দেখদেখি ঠাকুর ঝি।"

ঠাকুর-ঝি তখন বিরক্ত হইয়া বলিল—"তোমার ও সকল কথা এখন থাক, বউদিদি। এখন সুখদাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমি কি করে থাক্‌বো বল দেখি।"

অমলার কথা শুনিয়া শরৎকুমারীর চক্ষে জল আসিল। দুই হস্তে সে চক্ষের জল মুছিয়া শরৎকুমারী বলিল—"একটা রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের প্রতি যার এত ভালবাসা, তার গুণের কথ কি মুখে বলে শেষ করা যায়?"

অমলা একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—"তোমার কাছে বউ-দিদি, আমি কথায় পার্‌বো না।"

শরৎকুমারী।—আমি কেবল কথা জানি, কাজ জানিনে। তোমার কাজ দেখে কিন্তু সকলে অবাক্ হয়ে গেছে। তোমার দাদার কাছে শুনেছি—সুরেশ ও বাবু বলেছেন—"তুমি মানবী নও, মানবী আকারে দেবী।"

অমলার মুখখানি অমনি শুকাইয়া গেল। অমলা এরূপ আত্ম-প্রশংসায় ভীতিব্যঞ্জকস্বরে বলিল—"আমি সুরেশ বাবুকে দেবতার ন্যায় সম্মান ও ভক্তি করি, তিনি এমন কথা কেন বলেছেন বউ দিদি? সুরেশ বাবুর চেষ্টাতেই সব হয়েছে?"

শরৎকুমারী হাসিয়া বলিল—"সকল চেষ্টারই মুল কিন্তু তুমি